
বিষকন্যা-১
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বিষকন্যা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

অপর গাড়িটা মার্সিডিজ, শামুকের মত ধীরগতিতে এল। গাঢ় রঙ; কালো হতে পারে, কিংবা নীল। কোস্টাল হাইওয়ে ছেড়ে সরু পথটার ওপর নামল। এদিকেই আসছে।

জলপাই ঝোপের আড়ালে রয়েছে মাসুদ রানা, আরও বড় একটা ঝোপের পিছনে রয়েছে ভাড়া করা সিমকা। দ্বিতীয় গাড়িটা ওর পিছু নিয়ে এসেছে, তা নাও হতে পারে। রোডস টাউন ছাড়ার পর সতর্ক ছিল ও, পিছনে ফেউ লাগার কোন লক্ষণ চোখে পড়েনি। ভোর রাতে রওনা হয়েছে ও, আলো ফোটার আগেই পৌঁছে গেছে নির্জন পাহাড়ে। তবু, জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে পিছু নিয়ে কেউ এসে থাকলেও, এখানে ওকে দেখতে পাবে না।

নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, একটা চোখ থাকল গাড়িটার দিকে। সিমকা থেকে নামাল রাবারের ভেলা, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আর দশঘোড়ার একটা আউটবোর্ড।

মার্সিডিজ থামল না, তবে হেডলাইট নিভে গেল। দ্বীপের ওপর আকাশ প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এঞ্জিনের কোন শব্দ

পাচ্ছে না রানা, ভোরের পাখিরা চারদিকে কিচিরমিচির করছে।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্লথ হলো মার্সিডিজের গতি। জানালাগুলোর কাঁচ আয়নার মত চকচকে, ভেতরে দৃষ্টি চলে না।

চট করে বাম দিকে একবার মুখ তুলল রানা। লাল টালির বড়সড় ভিলার কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে বাগানগুলো, চওড়া একটা ধাপের ওপর তৈরি করা হয়েছে সুইমিংপুল। শেষ ধাপে ভিলাটা। রানার কাছ থেকে দুশো কি আড়াইশো গজ দূরে।

চোখ নামিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রানা, সাথে বোঝা থাকায় হাঁটার ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। খানিকক্ষণ হেঁটে খোলা একটা হেডল্যান্ডে বেরিয়ে এল ও, ঈজিয়ান সাগর থেকে একশো ফুট ওপরে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে সী গাল, বজ্রপাতের শব্দে পাথরে আছাড় খাচ্ছে একের পর এক ঢেউ। দিগন্তে এইমাত্র উঁকি দিল সূর্য, পুবের আকাশে যেন আগুন ধরে গেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কেউ নেই।

মার্সিডিজে করে যে-কেউ এসে থাকতে পারে। কত লোকই তো সূর্যোদয় দেখতে চায়। ভিলার কোন অতিথিও হতে পারে। সি.আই.এ. বা কে.জি.বি হওয়াও বিচিত্র নয়।

রাত শেষ হলেও, বাতাস এখনও কনকনে ঠাণ্ডা, বেদিং সুট পরে হি হি করছে রানা। ঘাস মোড়া কিনারার দিকে ঝুঁকল ও। কচি রোদ মাখা ঢালের রঙ শেয়ালের গায়ের মত লালচে। উত্তর দিকেও একটা হেডল্যান্ড দেখা গেল, সরু ও দীর্ঘ একফালি পাথুরে মাটি সাগরের ওপর গিয়ে পড়েছে। রোদ লেগে চকচক করছে ওখানে প্রাচীন একটা গ্রীক মন্দির। সাগরে, বহুদূরে, এক ঝাঁক মাছ ধরার বোট দেখা গেল, রাতের কাজ সেরে বাড়ির দিকে

ফিরছে জেলেরা। লাল, সবুজ, হলুদ আর নীল, একেকটা বোটের রঙ একেক রকম, খেলনার মত।

মেয়েটাকে প্রথমে দেখতে পায়নি রানা।

হুস করে পানির ওপর মাথা তুলল সে, তার চারপাশে নৃত্যরত সফেন সাগর ঝিকমিক করে উঠল। সরু, আধখানা চাঁদ আকৃতির সৈকতের দিকে এগোল মেয়েটা। রানার সরাসরি নিচে ওটা।

পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর উপলব্ধি করল রানা, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে ও। আশপাশে কেউ থাকলে ধরা পড়ে যেত, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে ওর। নারী, বিশেষ করে সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী যুবতী, কাকে না আকর্ষণ করে। তবে নিজেকে নিয়ে রানার একটা গর্ব আছে—কোন মেয়ে, তা সে যত সুন্দরীই হোক, তার কোন বৈশিষ্ট্য ওকে বিশেষভাবে নাড়া না দিলে ওর মনোযোগ কাড়তে পারে না। তাছাড়া, মেয়েদের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কোন সুযোগ নেয়ার মানসিকতাও ওর নেই।

এই মেয়েটার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল ও? আপনমনে হেসে ফেলল রানা, নিজের কাছে স্বীকার করল, অপূর্ব একটা শরীর ছাড়া আর কিছু ওর নজরে পড়ছে না। তবে, সেটাই যথেষ্ট। এরকম দৈহিক গঠন আগেও দু'একটা দেখেছে রানা, যার সাথে শুধু কচি পুঁই ডগার তুলনা চলে। অস্বাভাবিক লম্বা মেয়েটা, রোগা, কিন্তু কোথাও হাড় বেরিয়ে নেই। নাক-চোখ পরিষ্কার ঠাহর করা গেল না, তবে মুখের আকৃতি গ্রীক দেবীদের মত। তার নগ্ন বাহু আর পিঠ সোনালিবরণ, সেই সোনা রঙের ওপর দীর্ঘ কালো চুল সাপের মত মোচড় খাচ্ছে।

ঘাস মোড়া কিনারায় বসল রানা। কিনারা থেকে প্রথম কয়েক ফুট ঢাল প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে, খুব সতর্কতার সাথে নামতে

হবে ওকে। পা দুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল ও। এই সময়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, চওড়া কাঁধ নিয়ে বেঁটে এক লোক হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হলো, সৈকতের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝট করে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল, তারপর চিৎকার করে কি যেন বলল মেয়েটাকে।

পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। সে-ও পাল্টা চিৎকার করল। তার সুন্দর মুখে আড়ষ্ট একটা ভাব লক্ষ করল রানা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল গলা ফাটানোর প্রতিযোগিতা। তারপর, সম্ভবত হেরে গিয়ে, রিভলভারটা মেয়েটার দিকে তাক করল ভিলেন। আর কিছু করার না পেয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা পাথর তুলে ছুঁড়ল রানা।

ঢালের ওপর পড়ল পাথরটা, গড়াতে গড়াতে নামছে। হকচকিয়ে মুখ তুলল লোকটা। রানাকে দেখেই ঝট করে আধপাক ঘুরে দৌড় দিল। লোকটা পালাচ্ছে, নাকি তার প্রস্থান স্রেফ অস্থিরতার প্রকাশ, ঠিক বুঝতে পারল না রানা। বড় বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

লাফ দিল রানা, ঢালে পড়ল, তাল সামলে নিয়ে সবেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

বুক সমান পানি থেকে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। সাঁতরাল কিছুক্ষণ, তারপর ছোট্ট একটা সমতল পাথরের গায়ে থামল। পানির ওপর মাথা তুলে রয়েছে পাথরটা, লম্বায় তিন ফুটের বেশি নয়। কিনারায় হাত রেখে লাফ দিল যুবতী, পাথরের ওপর উঠে পড়ল। রানার দিকে ফিরে দু'কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে। সোনালি গা থেকে পানি ঝরছে।

সৈকতে নেমে পানির দিকে এগোল রানা। শুধু শরীর বা

যৌবন নয়, মেয়েটার দাঁড়াবার আকর্ষণীয় ভঙ্গি লক্ষ করে বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে ওর। অনেক কষ্টে নিজেকে সচেতন রাখল ও, পিছন থেকে বিপদ আসতে পারে।

মেয়েটা সম্পর্কে যা কিছু জানে ও, সবই ডাচ জর্জের কাছ থেকে শোনা। ছাব্বিশ বছর বয়েস, লেখাপড়া শিখেছে এথেন্স আর সুইটজারল্যান্ডে, এককালে ওদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বাবা ছিলেন এয়ারফোর্সে, মেজর। সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেন ভদ্রলোক, ফলে জেলখানায় নিহত হন। তাঁর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাণভয়ে মায়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যায় মেয়েটা, দু'বছর পর সরকারের পতন ঘটলে একাই ফিরে আসে গ্রীসে।

ডাচ জর্জের সাথে মেয়েটার পরিচয় হয়েছে বছর দু'য়েক আগে রঁদেভো ক্লাবে। ওখানে গান গায় সে।

'এদিকে কি?' সাপের মত ফোঁস করে উঠল মেয়েটা, রানাকে পানির কিনারায় পৌঁছুতে দেখে বুঝতে পারছে তার কথা শোনা যাবে। 'যাও, নিজের চরকায় তেল দাও।'

'অবলা নারীকে সাহায্য করা আমার একটা ব্রত,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমার এই ব্রত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বিচ্যুত করতে পারেনি।' বোঝাগুলো বালির ওপর নামিয়ে রাখল রানা।

'হ্যাঁ, বলেছি বটে তোমার একটা উপকার করব, কিন্তু তারমানে এই নয় যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার দেয়া হয়েছে তোমাকে!' জেদ আর রাগের সাথে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, ভঙ্গিটা ভারি সুন্দর লাগল রানার চোখে। কথা আর ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা, স্বাধীনচেতা মেয়ে। 'তুমি

মাসুদ রানা, তাই না?'

'আর তুমি মিলি, তাই না? মিলি পুলটিস?' কথা শেষ করে পানিতে নামল রানা।

'দাঁড়াও ওখানে!' ঝাঁঝের সাথে বলল মিলি, তবে ঠিক নির্দেশের মত শোনাল না। সমতল পাথর থেকে নিখুঁতভাবে ডাইভ দিল সে, ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে, ডুব সাঁতার দিয়ে চলে এল সৈকতের কিনারায়।

বালির ওপর উঠে এসে আবার ঝাঁঝের সাথে বলল, 'নড়বে না!'

মিলির পরবর্তী আচরণ হতবাক করে দিল রানাকে। এত দিন ওর ধারণা ছিল, এ-ধরনের আচরণ শুধু পুরুষদেরই মানায়। রানাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে, চোখে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টি, যেন অত্যন্ত দামী একটা চিত্রকর্ম নকল কিনা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। খানিকটা অস্বস্তিবোধ করল রানা, খানিকটা কৌতুক। দু'বার চক্কর দিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল মেয়েটা। শেষ একবার চোখ বোলাল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'তোমার সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না,' বলল সে। 'সম্ভবত আমি একটা বোকা, কারণ তোমাকে আমার ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

'হয়তো আমার সম্পর্কে জানার সুযোগ তোমার হবে,' বলল রানা। 'রিভলভার হাতে লোকটা কে ছিল?'

'কোস্টাস? আমার বয়ফ্রেন্ড।'

'বন্ধু? বন্ধু হলে রিভলভার বের করবে কেন? আমার তো মনে হলো, লোকটা তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল।'

খিল খিল করে হেসে উঠল মিলি। 'আরে না! এটা ওর একটা নেশা! সব সময় আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। সত্যি কথা

বলব? ব্যাপারটা আমি দারুণ উপভোগ করি।'

'কোস্টাস অ্যারোনাফিস,' বিড় বিড় করে বলল রানা। 'সাবেক গ্রীক ডিপ্লোম্যাট? অমিশুক, ঘরকুনো কোটিপতি?' ভিলাটা তার, জানে রানা।

মাথা ঝাঁকাল মিলি। 'কোস্টাস খুব সতর্কতার সাথে বন্ধু বাছাই করে। আমাকে দেখে বুঝছ না?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

তার অর্ধনগ্ন শরীরটার ওপর আরেকবার চোখ না বুলিয়ে পারল না রানা। 'আর তুমি?'

চোখ নামিয়ে নিল মিলি। 'আমিও খুব খুঁতখুঁতে।' পটলচেরা কালো চোখ দুটো তুলে বড় বড় পাথরগুলোর দিকে তাকাল সে, থমথমে হয়ে উঠল চেহারা, নিচু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'কেউ যেন মনে না করে আমি তার কেনা হয়ে গেছি। আমি কোন পণ্য নই যে বিক্রি হতে পারি। এটাই বুঝতে চায় না কোস্টাস। তার অভিযোগ, এত সকালে এখানে আমি এসেছি নিশ্চয়ই কারও সাথে দেখা করতে। কি হলো, যদি এসেই থাকি?'

ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল রানার। 'আমাদের কথা জানে সে?'

'সম্ভবত আন্দাজ করে নিয়েছে...অসম্ভব ঈর্ষাকাতর লোক।' মুখ তুলল মিলি, চোখে অদ্ভুত একটা জেদ ফুটে উঠল। হঠাৎ রানার দিকে এগোল সে। 'এসো, ওর গায়ে যাতে আগুন ধরে তার ব্যবস্থা করি।' বলে হাত দুটো মেলে দিয়ে রানাকে আহ্বান জানাল।

'কি...না, মানে...ধন্যবাদ, এখন নয়,' বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে শান্ত সুরে বলল রানা। কর্মজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, খুন লোভনীয় কোন জিনিস সাধনা ছাড়াই পাওয়া

যাচ্ছে দেখলে সতর্ক হতে হয়। লোভ, লালসা চরিতার্থ বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে ফাঁদ পাতা হলে সে-ফাঁদে রানা পা দেবে না। মিলি মেয়েটা সম্পর্কে খুব কম জানে ও, তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, গাঢ় রঙের মার্সিডিজটার কথা মনে আছে ওর। ওপরে কোথাও আছে সেটা।

রানা প্রত্যাখ্যান করায় অবাক হয়ে গেল মেয়েটা। অপমান বোধ করল এক সেকেন্ড পর। ইতিমধ্যে রানার গায়ে সেঁটে এসেছে সে, ভিজে ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক। তার মুখের ভেতরটা বিড়ালের মত, ফ্যাকাসে লাল। 'কি হারাচ্ছ জানো?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সে। জেদ আর চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠল চেহারায়। 'নাকি অপাত্রে দান করতে চাইছি? চুমো খাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাকে আমি সম্মান দেখিয়েছি, সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও কি তোমার নেই?'

'যদি সত্যি সম্মান দেখিয়ে থাকো, আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'তবে তুমি একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছ, তাই না? আমাকে তুমি ব্যবহার করতে চেয়েছ।'

'তুমি বলছ অভিনয়টা সত্যি অতটা নিখুঁত হয়েছে? এত নিখুঁত যে মুখে যা বলেছি তাই তুমি বিশ্বাস করেছ? আসলে আমি একটা অজুহাত খুঁজছিলাম। কোস্টাসকে ঈর্ষাকাতর করে তোলার জন্যে আয়োজনের দরকার হয় না, এমনিতেই সারাক্ষণ জ্বলছে সে। তাই বলে ভেবো না যে তোমাকে দেখেই আমি মজে গেছি।' হঠাৎ দুষ্টু হাসি দেখা গেল মিলির চোখে। 'তবে, মনে হলো, আমার সামনে এটা কি? জাদু, স্বপ্ন, নাকি সত্যি? তাই একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলল রানা। 'কি জানো, সব জিনিসেরই

একটা সময় আছে। তোমার বন্ধু আসলে আমাকে নার্ভাস করে তুলেছে, ব্যাপারটা আমি এনজয় করব না। ভাল কথা, তুমি বা মি. অ্যারোনাফিস বোধহয় আরও কোন অতিথির অপেক্ষায় ছিলে, তাই না?'

'এত ভোরে? ধ্যেৎ!'

উদ্বিগ্ন হলো রানা, তবে চেহারায় হাসি-খুশি ভাব এনে বলল, 'যাক, আশংকামুক্ত হলাম। চলো, ভেলাটা ভাসিয়ে এখান থেকে সরে যাই।'

পনেরো মিনিট পর ছোট্ট আউটবোর্ডের এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাত বাড়িয়ে টোকা দিল মিলির কাঁধে। ঘাড় ফেরাল মিলি, চুলে জড়ানো কালো নেটের প্রান্ত সরাল চোখ থেকে। 'ভাল করে দেখে বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানেই কি তুমি জলপরী মেমোটা পেয়েছিলে?'

'জলপরী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মিলি। 'মানে?'

'তুমি পেয়েছ ওটা, তাই তোমার নামে নাম রাখা হয়েছে।'

হেসে উঠল মিলি। 'আমি জলপরী? বাহ্।' পরমুহূর্তে রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'কিন্তু ওটা তো শুধু একটা পাতা ছিল, লগের একটা ছেঁড়া...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু পাওয়া গেছে কয়েকশো মাইল অফ-কোর্সে।'

'এ-ব্যাপারে বিদেশী একজন লোক কেন এত আগ্রহী হতে যাবে?'

'কারণ জাহাজটায়, নেমিসিসে, একজন ভি.আই.পি. ছিলেন।'

'কে?' খোলামেলা কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকাল মিলি। তার কালো বেদিং সুটের ওপরের অংশটা দিয়ে খুব বেশি হলে

একজোড়া বড় আকারের চোখ ঢাকা যাবে, তার বেশি ঢাকতে গেলে টান পড়বে কাপড়ে।

অনেক কষ্টে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে আনল রানা, আপনমনে মাথা নাড়ল একবার, তারপর বলল, 'প্রয়োজনের বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'ভি.আই.পি. ভদ্রলোকের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? কেন ভাবছ, এ-সব আমার জানার প্রয়োজন নেই? গ্রীক সরকার কেন তদন্ত করছে না?'

'আপাতত তোমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'তুমি ডাচ জর্জকে চেনো, তাকে বিশ্বাস করো, কাজেই তার পাঠানো লোককেও তোমার বিশ্বাস করতে হবে।'

চেহারায় প্রতিবাদ নিয়ে রানার দিকে দ্রুত তাকাল মিলি, কিন্তু কি মনে করে কিছু বলল না। দু'বার ঠোঁট কামড়াল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়প্রাচীরের দিকে তাকাল।

ঘন সবুজ ঝোপ, সার সার পামগাছ আর বাঁশঝাড়গুলো চিহ্নিত করছে কোস্টাস অ্যারোনাফিসের ভিলাটা। মিলির দৃষ্টি সরে গেল বামের হেডল্যান্ডের দিকে, সেখান থেকে বিধ্বস্ত মন্দিরটার ওপর স্রেফ পাথরের একটা স্তূপ আর সোনালি দুটো স্তম্ভ, মনে করিয়ে দেয় ট্রোজান ওঅর-এর কথা। 'আমি ডাইভ দিচ্ছিলাম,' বলল মিলি। 'দিনের ঠিক এই সময়টায়। হ্যাঁ, এই সেই জায়গা।'

রানার চোখের কোণে হঠাৎ কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল, যেন বহুদূরে কাঁচের ওপর রোদ লেগেছে। এয়ার-ট্যাংকের হারনেস গলায় পরার সময় কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'তোমার মনে হয়, মি. অ্যারোনাফিস তাকিয়ে আছেন এদিকে?'

‘কে গ্রাহ্য করে?’

‘কেউ নিশ্চয়ই করে।’

‘তাহলে আমার বোধহয় বিবস্ত্র হওয়া উচিত।’

‘তা হতে অল্পই তো বাকি।’

‘বাকিটুকু সরিয়ে নিলে কানা হয়ে যাবে ওরা।’

‘কিংবা ওদের হার্ট অ্যাটাক করবে।’

নিচের ঠোঁটের প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মিলি, হাসছে সে। কিন্তু রানা হাসতে পারল না। চারদিকে বৈরী সাগর ফুঁসছে, বিপুল জলরাশির মাঝখানে নগ্ন লাগছে নিজেকে ওর। আন্দাজ করল, বন্দুকের গুলি ওর নাগাল পাবে না। তবে অস্ত্রটা যদি হাই-পাওয়ারড, স্কোপ-সাইটেড হান্টিং রাইফেল হয় তাহলে কি ঘটবে বলা যায় না।

আউটবোর্ডের কিনারা থেকে পানিতে নামল রানা।

‘বী কেয়ারফুল,’ সতর্ক করল মিলি।

‘আমাকে ফেলে পালিয়ে যেয়ো না,’ বলল রানা। ‘আউটবোর্ডটা ব্যবহার করো, তা না হলে স্রোতের টানে পজিশন থেকে সরে যাবে।’

‘পালিয়ে যাব?’ হেসে উঠল মিলি। ‘সে চেষ্টা সাধারণত তোমরাই করো, অন্তত আমার কাছ থেকে।’

‘আমরা?’

‘পুরুষরা।’

চল্লিশ ফুট নিচে পাথুরে সাগরতল, ঢাকা পড়ে আছে ঝাঁক ঝাঁক মাছের তৈরি রঙচঙে পর্দায়। সাগরের তলাটা রানার ডানদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, আলোহীন বিশাল একটা গহ্বর যেন

হাঁ করে আছে ওদিকে, দশ হাজার ফুট গভীর। শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে স্রোতের চাপ ভৌতিক স্পর্শের মত লাগল। সবুজাভ আলোয় আগুপিছু করল রানা। ঠিক জানা নেই। কি পাবে বলে আশা করছে ও। কে জানে আদৌ কিছু পাবে কিনা। রহস্যময় লগের আরও দু'একটা পাতা, প্রবালের সাথে আটকে আছে? উল্টে থাকা কোন কার্গো? নেমিসিস জাহাজটার কাত হয়ে থাকা খোল…?

আধ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা হলো রানার। ডান দিকে বিশাল গহ্বর থেকে উঠে আসা কনকনে ঠাণ্ডা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল শরীরে। ক্লান্ত হবার সাথে সাথে স্রোতের চাপ আরও বেড়েছে, গভীর সাগরে তলিয়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্যে প্রতি মুহূর্তে লড়তে হচ্ছে ওকে। ফিরে আসবে, এই সময় দেখতে পেল ব্যারেলটা।

পাথুরে ঢালের ওপর, বড় আকারের একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে পড়ে রয়েছে ওটা। সামুদ্রিক আগাছা প্রায় ঢেকে রেখেছে বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি। ঢাকনিটা খুলে গেছে, তবে পুরোপুরি নয়। স্রোতের ছায়াগুলো বিবর্ণ সাগরতলের গায়ে ধূসর বেগুনি, তার মাঝখানে ব্যারেলের আধখোলা মুখটা ঠিক যেন হাঙরের বীভৎস হাসি হাসছে।

তির্যক একটা পথ ধরে নামছে রানা, ওর ব্রিদিং অ্যাপারেটাস হিসহিস করে উঠল। দূর থেকে ভেসে আসা আউটবোর্ডের ভোঁতা ভট ভট শব্দ শুনতে পেল ও। সাগরের উঁচু-নিচু মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে আরও জোরাল হয়ে উঠেছে স্রোত, রানার দিকে ধেয়ে এল অকস্মাৎ উথলে ওঠা একটা নদীর মত। স্রোতের চাপে সামুদ্রিক আগাছাগুলো মেঝেতে সেঁটে গেছে। কালো লতাগুলো কিলবিল করছে সাপের মত। ব্যারেলটা ধরে স্রোতের বিরুদ্ধে সিধে হয়ে

দাঁড়াল রানা, টর্চ জ্বেলে ভেতরে আলো ফেলল। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মিহি হলুদ একটা পদার্থ। তার নিচে বালি, স্টীল কন্টেইনারটা যেন পলিমাটি দিয়ে ভরা হয়েছে।

ঢাকনিটা ধরে অনেক টানাটানি করল রানা, কিন্তু সবটুকু খুলতে পারল না।

ওয়াটারপ্রূফ ক্রোনোমিটার চেক করল ও। পিঠে আটকানো ট্যাংকে আর দশ মিনিটের বাতাস আছে।

ঢাকনি খুলতে না পেরে পিছিয়ে এল রানা, ব্যারেলের গায়ে কিছু লেখা আছে কিনা পরীক্ষা করল। এই সময় পানিতে ঠিক শব্দ নয়, মৃদু একটা কাঁপন অনুভব করল ও। গুরুত্ব দিল না। দেখল, ব্যারেলের গায়ে কোন লেখা বা মার্কিং নেই। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ব্যারেলের ভেতর একটা হাত ঢোকাল।

কাদার মত জিনিসটা, ঘন ও কোমল। হাতটা বের করে আনার পর আঙুলে লেগে থাকল হলুদ মাখনের মত।

কাঁপনটা ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে। এবার ওটাকে একটা শব্দ বলে চিনতে পারল রানা। হলুদ পদার্থটা দুই আঙুলের মাঝখানে নিয়ে ঘষল ও। মনের কোণে একটা উদ্বেগ মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। পানির স্রোতে পরিষ্কার হয়ে গেল হাতটা। শব্দটা বাড়ছে।

হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল রানা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল ও। কানে এখন ভারি লাগছে শব্দটা, চিনতেও অসুবিধে হচ্ছে না। বোট প্রপেলারের আওয়াজ।

এক মুহূর্ত পর কালো খোলটা দেখতে পেল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে জাহাজটা।

সাগরের নিচে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। জাহাজটাকে চিনতে পারার পর হঠা ঝপাৎ করে শব্দ হলো পানিতে। মুখ তুলে

দেখল এক রাশ বুদ্বুদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে মিলির আকৃতিটা। তার মুখ যেন আতঙ্কে বিকৃত একটা মুখোশ, ধেয়ে আসা জাহাজের পথ থেকে সরে আসার জন্যে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে সে।

কিন্তু পালাবার কোন পথ খোলা নেই। চেহারায় নগ্ন বিস্ময় আর হতাশা নিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, এখনও মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। কালো হয়ে গেল মাথার ওপরটা, জাহাজের খোলে ঢাকা পড়ে গেল আলোকিত আকাশের আভাটুকু। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা, ফুটবলের মত ঘন ঘন বাড়ি খেলো পাথুরে মেঝেতে। মৃত্যু ভয় জাগল মনে, সেই সাথে তীব্র হয়ে উঠল বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। পানির এলোমেলা স্রোত নির্দয় শত্রুর মত ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, দিক্‌ভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন বোধ করল রানা, তা সত্ত্বেও ব্রিদিং-মাউথপীসটা হাত দিয়ে দুই চোয়ালের মাঝখানে আটকে রাখার বুদ্ধিটা লোপ পেল না। চারদিকের পানি ঘোলা হয়ে গেল, তবে আবছাভাবে আশপাশটা চেনা যাচ্ছে এখনও।

ওর চারপাশে চিক চিক করছে বালি আর পলিমাটি। ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ্ বেরিয়ে আসছে বিধ্বস্ত ভেলাটা থেকে, বিশাল কালো গহ্বরটার দিকে ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে গেল সেটা। কাছাকাছি মাকড়সার জালের মত মিলির কালো চুল, কিছু একটা ধরার জন্যে ঘন ঘন হাত বাড়াচ্ছে সে, মুঠোর ভেতর কিছুই পাচ্ছে না।

ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা।

প্রশ্নটা আপন অস্তিত্ব রক্ষার, ভাল-মন্দ দিকগুলো এক নিমেষে উপলব্ধি করল রানা। বিপদে পড়লে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে

নেই। তীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে ওরা, কাছে পিঠে ভাসমান বস্তু বলতে ছিল শুধু ভেলাটা, বাঁচতে হলে সাঁতার কেটে সৈকতে পৌঁছুতে হবে। মাছ ধরার বোটগুলো এখান থেকে অনেক দূরে, দুর্ঘটনা বা হামলাটা চাক্ষুষ করেনি জেলেরা। ভেলাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেছে জাহাজটাও, পানিতে এখন আর প্রপেলারের কোন কম্পনও নেই। আতঙ্কে অস্থির একটা মানুষ, বিশেষ করে একটা মেয়ে, সাঁতার কেটে সৈকতে পৌঁছুতে পারবে না। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করা মানে, সহজ হিসেবেই, নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া। তাছাড়া, আরও চিন্তা করল রানা, আজই মাত্র খানিক আগে পরিচয় হয়েছে মেয়েটার সাথে, তার প্রতি ওর কোন দুর্বলতা নেই। বুদ্ধিমানের কাজ হবে পানির ওপর উঠে সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা, তারপর সৈকতের দিকে এগোনো। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে, স্রোতের সাহায্য পেলে, এ-যাত্রায় নিজের চেষ্টায় বেঁচেও যেতে পারে ও।

পরিস্থিতির বাস্তবতা কেন জানি অগ্রাহ্য করল রানা। সাগরের মেঝেতে পায়ের ধাক্কা দিয়ে মিলির পাশে চলে এল ও। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে নিজের মাউথপীসটা খুলে গুঁজে দিল মেয়েটার দুই ঠোঁটের মাঝখানে।

ঘসা কাঁচের মত পানির সারফেসটাকে হাজার মাইল দূরে বলে মনে হলো। পায়ে লম্বা ফিন না থাকলে পানির ওপর মাথা তোলা সম্ভব হত না। বাতাসে মুখ তোলার সাথে সাথে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল আটকে রাখা নিঃশ্বাস। নিজেকে এক মুহূর্ত সময় দিল না রানা, বাতিল ডাইভিং ইকুইপমেন্ট গা থেকে খুলে ফেলে দিল। রানাকে খামচে ধরল মিলি, নরম আর মাংসল একজোড়া ঊরু পেঁচিয়ে ধরল রানাকে। দু'জন একসাথে ডুবছে।

আবার পানির নিচে নেমে এল ওরা। কনুই আর হাঁটু চালিয়ে নিজেকে ছাড়াল রানা। স্রোতের টানে সরে যাচ্ছে মিলি, দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তার চুল ধরে ফেলল ও। তারপর টেনে তুলল পানির ওপর।

কাশতে কাশতে মাথা তুলল মিলি, পানির ওপর গড়ান দিল দু'বার, আবার হাত বাড়াল রানাকে খামচে ধরার জন্যে। দ্রুত তার নাগালের বাইরে সরে এল রানা। 'পিঠের ওপর ভাসো,' চিৎকার করল ও।

'আমাকে ফেলে যেয়ো না!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মিলি, গলার স্বরে করুণ আর্তি। 'আমাকে বাঁচাও!'

'কথা বললে হাঁপিয়ে যাবে,' বলল রানা, দেখল ওর কথামত পানির ওপর পিঠ দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে সে।

বেদিং সুটের ওপরের অংশ, ব্রেসিয়ারটা, হারিয়েছে মিলি। দূরে তাকিয়ে কালো জাহাজটা দেখতে পেল রানা। অনেক দূরে চলে গেছে, ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। ওটার পিছনের অংশ তীক্ষ্ণ, রেখাগুলো সরু দেখে রানার ধারণা হলো, কারও ব্যক্তিগত মোটর ইয়ট হবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুয়াশার ভেতর ঝাপসা হতে হতে হারিয়ে গেল জাহাজটা।

এবার সবুজ পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপটার দিকে তাকাল রানা। বিস্ফোরিত ঢেউয়ের জলকণাগুলো দ্বীপের নিচের দিকটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। বিপদের গুরুত্ব আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে রানা, পানিতে ওঠার পর চাক্ষুষ করল সেটা—স্রোতের তীব্র টান গভীর সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। সৈকত আর ওদের মাঝখানে ক্রমশ, প্রতি মুহূর্তে চওড়া হচ্ছে সাগর।

সময় বয়ে চলল। সেই সাথে পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। স্রোতের

টান বাড়ছে আরও। আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে ঢেউগুলোকে সামলানো। একের পর এক ঢেউয়ের মাথায় উঠছে ওরা, কোন কোন ঢেউ ওদেরকে চাপা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, বা ওদের ওপর ভেঙে পড়ছে।

পানির সাথে যুদ্ধ না করে শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করছে রানা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে যাবার পর মনে মনে স্বীকার করল, বাঁচার আশা নিতান্তই ক্ষীণ। অবশ্য ওর পেশায় পুঁজি বলতে ক্ষীণ আশাকেই বোঝায়। তবে, মেয়েটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে বিরতিহীন চেষ্টা করতে হচ্ছে বলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে রানা। ও যদি একা হত, আরও আশাবাদী হওয়ার যুক্তি ছিল।

ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে এল হাত আর পায়ের পেশী। লোনা পানিতে চোখ জ্বালা করছে, মাঝে-মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিন্তা-ভাবনা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ, কত হাজার হাজার লোক ডুবে মরেছে এই সাগরে। ওদের নিচে পানির গভীরতা দশ নাকি বিশ হাজার ফুট?

ছোট ছোট, সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলছে মিলি। কথা বললে শক্তি নষ্ট হবে, রানার নির্দেশ মত তাই চুপ করে আছে সে। তবে রানা কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারল। বলল, 'এ আমি জানতাম, নিজের প্রাপ্যটুকু মানুষ পায় না...'

'কথা নয়!' সাথে সাথে বাধা দিল রানা।

কিন্তু থামল না মিলি, 'প্রাচীন দেবতারা আজও অলিম্পিয়ায় আছেন, তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো। তাঁরা সবাই নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি আর রেষারেষি নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের কথা ভাবার সময় কোথায়!'

কয়েক সেকেন্ড পর, আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে, পানির নিচে তলিয়ে গেল মিলি।

ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল রানা। শরীরের আড়ষ্ট ভাব হতভম্ব করে দিল ওকে। হাত বা পা ওর নির্দেশ মানতে অস্বাভাবিক দেরি করছে। মনের জোর খাটাতে চেষ্টা করল রানা, হাতটাকে লম্বা করে দিল, আর তাতেই ফুরিয়ে গেল অবশিষ্ট শক্তিটুকু।

অবিশ্বাস্য লাগল রানার। হঠাৎ একি হলো!

শেষবার দূরে তাকাবার চেষ্টা করল ও। তীর বহুদূরে, দেখা যায় কি যায় না। মনে পড়ল, লন্ডনে ছিল ও, ঢাকা থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় ওর সাথে। একে একে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

তারপর পানির তলায় নেমে গেল মাথাটা।

দুই

বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে নির্দেশ পেল মাসুদ রানা।

'এম.আর. নাইন?'

'বলছি,' লন্ডন থেকে কথা বলছে রানা।

'হেডকোয়ার্টার ডি.। অলিম্পিক এয়ারওয়েজের পাঁচশো তেইশ নম্বর ফ্লাইটে আপনার জন্যে একটা সীট রিজার্ভ করা হয়েছে।'

'শালার মাথা খারাপ' বলে চেঁচিয়ে ওঠার ঝোঁকটা দমন করল রানা। অপর প্রান্তে বন্ধুবর সোহেল আহমেদ থাকলেও, আন্তর্জাতিক লাইনে এমন কিছু বলা উচিত নয় যার দরুন ওদের পরিচয় বা সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যেতে পারে। 'কেউ নিশ্চয়ই গুলিয়ে ফেলেছে,' বলল ও। 'আমার জানা মতে, অলিম্পিকের কোন ফ্লাইট আদ্দিস আবাবায় যায় না।'

'এথেন্সে যায়,' বলল সোহেল।

এবার শুধু বিরক্ত নয়, মনে মনে রেগে গেল রানা, শুকনো গলায় বলল, 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, আমাকে কিছু না জানিয়েই বদল করা হয়েছে প্ল্যান?'

'মেজর জেনারেল রাশেদুল হাসান আপাতত সামলে নিয়েছেন পরিস্থিতি, অস্ত্র চোরাচালানীরা তাদের ট্রাক বহর নিয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা বাদ দিয়েছে। ইথিওপিয়ায় এই মুহূর্তে আপনার না গেলেও চলবে।'

অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আদ্দিস আবাবায় যাবার জন্যে দু'হপ্তা ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছে রানা। মুহূর্তের নোটিসে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলতে হলো ওকে, গ্রীস সম্পর্কে যা কিছু জানে স্মরণ করার চেষ্টা করল। 'কখন ছাড়বে আমার প্লেন?' জানতে চাইল ও।

'আপনার হাতে সময় আছে,' অপরপ্রান্তে বিরতি নিল সোহেল, সম্ভবত হাতঘড়ি দেখছে, 'ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট।'

'ইমার্জেন্সী মনে হচ্ছে?'

'জেড ক্লিয়ার্যান্স দেয়া হয়েছে আপনাকে, এম.আর.নাইন।

এথেন্সে আপনাকে ব্রিফ করবে চন্দন সরকার।'

গভীর কোন চিন্তায় বা সংকটে পড়লে প্রায়ই যেমন হয়, রানার চোখের কালো অংশটুকু আরও গাঢ় হয়ে উঠল। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুলে আঙুল চালাল ও। জেড ক্লিয়ার‍্যান্স মানে হলো, যে-কোন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে, আত্মরক্ষার জন্যে যে-কোন ব্যবস্থা নিতে পারে রানা–এমনকি সন্দেহবশত খুন করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে ওকে। এই অনুমতি কখনোই লিখিতভাবে দেয়া হয় না। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর মাত্র তিনজন এজেন্ট কালেভদ্রে এই অনুমতি পায়, তাদের মধ্যে রানা একজন। জেড ক্লিয়ার‍্যান্স-এর আরেকটা অর্থ হলো, কোন অবস্থাতেই ধরা পড়া চলবে না। এই অনুমতি একজন এজেন্টকে আইনের ঊর্ধ্বে তুলে দেয়।

দশমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল রানা।

দক্ষিণ এথেন্সের এলিনিকন এয়ারপোর্ট, রাত ন'টার খানিক আগে পুব টার্মিনালের কাছাকাছি ল্যান্ড করল প্লেনটা। আরোহীদের সাথে নেমে এল প্রায় ছ'ফুট লম্বা সুদর্শন এক যুবক। লাগেজগুলো লকারে জমা রেখে কিছু টাকা ভাঙাল সে, ডলারের বিনিময়ে নিল ড্রাকমা। পেশায় এসপিওনাজ এজেন্ট, মুহূর্তের নোটিসে কোত্থেকে কোথায় ছুটতে হয় তার ঠিক নেই, তাই সাথে সব সময় মার্কিন ডলার রাখে সে।

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরোবার সময় চোখ-কান খোলা রাখল যুবক। চারদিকে প্রচুর লোকজন। কেউ লাগেজ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, একদল লোক বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছে, আবার কেউ লাউঞ্জের সোফায় বসে অলসভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে।

অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যুবকের দিকে। তাকাল, কিন্তু চিনতে পারল কি, ইউরোপিয়ান পোশাক পরা এই স্মার্ট যুবকটি আসলে জীবনানন্দ দাশ আর জসিম উদ্দিনের রোদনক্লিষ্ট বাংলা মায়ের এক দামাল সন্তান। চিরতরুণ মাসুদ রানা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। বুক ভরা দেশপ্রেম আর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে রোমাঞ্চের নেশা, তারই সংক্ষিপ্ত নাম এম.আর.নাইন। সর্বগ্রাসী হতাশার অন্ধকারে রানা যেন একটা আশার শিখা।

গোটা সমাজ যখন বিশৃংখলার শিকার, নৈতিকতা যখন পদদলিত, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ, তখনও কিছু মানুষ লোভ আর পাপের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারেন, তারই জলজ্যান্ত একটা দৃষ্টান্ত মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফসল। সারা দেশে তল্লাশী চালিয়ে মেধা আর প্রতিভা খুঁজে বের করেন তিনি, নিজের হাতে গড়ে তোলেন সৎ ও নির্ভীক বি.সি.আই. এজেন্ট।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও দরিদ্র হলেও, তার শত্রুর কোন অভাব নেই। বাংলাদেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র কোথায় না চলছে। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে সুযোগ্য বি.সি.আই. এজেন্টরা। মেজর মাসুদ রানা তাদেরই একজন।

দুনিয়ার যে-কোন দেশে, যে-কোন পরিবেশে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে রানা। প্রায় এক ডজন ভাষায় চমৎকার দখল রয়েছে ওর। লোলচর্মসর্বস্ব অথর্ব বুড়ো, জাপানী যুবরাজ বা শ্বেতাঙ্গ মাস্তান সাজা ওর জন্যে কোন সমস্যা নয়,

ছদ্মবেশ ধারণের সমস্ত কৌশল ওর জানা। সব ক'টা মহাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় থাকায় যে-কোন জনগোষ্ঠির সাথে অনায়াসে এক হয়ে মিশে যেতে পারে ও।

এথেন্সের জরাজীর্ণ সিনটাগমা স্কয়্যারে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। রাস্তার ওপারে হেলেনিক পার্লামেন্ট বিল্ডিং, এক সময়কার রয়্যাল প্যালেস। অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের সমাধির চারপাশে পাহারায় রয়েছে গার্ডরা, মাথায় ঐতিহ্যবাহী ফেজ, পরনে কড়া ভাঁজের স্কার্ট, জুতো আর পোশাকের অনেক জায়গায় রঙিন সুতো আর পালক দিয়ে তৈরি অলংকার। চারপাশে দেশী-বিদেশী প্রচুর দর্শক ভিড় জমিয়েছে, কিন্তু গার্ডদের চোখে পলক পড়ছে না, অনড়-অটল দাঁড়িয়ে আছে তারা, ভাবলেশহীন চেহারা।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা। শান্ত, কিন্তু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চৌরাস্তাটা দেখে নিল একবার।

সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। ওর সম্ভাব্য শত্রুদের গতিবিধি বিবেচনার মধ্যে রেখে হেডকোয়ার্টার ঢাকার অত্যাধুনিক কম্পিউটার জানিয়ে দিয়েছে, রাস্তায় বেরিয়ে নিরাপদ চারদেয়ালের ভেতর ফেরত আসার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ, যদি পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকতে পারে ও। সিকিউরিটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সময় বলেছে, রানা যে আজও বেঁচে আছে সেটাই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চারপাশটা দেখে নিয়ে স্বস্তিবোধ করল রানা। কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না।

নিউজস্ট্যান্ডের লাগোয়া বুদ থেকে চন্দন সরকারকে ফোন করল ও। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিপলু মোসাড এজেন্টদের হাতে খুন হবার পর এথেন্স কন্ট্রোল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে চন্দন সরকার।

এর আগে তার সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছে রানার।

'আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল চন্দন।

'না।'

'দেখা-সাক্ষাতের সময়টা একটু পিছিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলল চন্দন। 'সবাই নির্দিষ্ট সময়ে এক জায়গায় জড়ো হতে পারবে না জানতে পেরে...'

তার সব কথা শুনল না রানা, পাল্টা কিছু বললও না। বুদের বাইরে লোকজনের গতিবিধি লক্ষ করছে ও। ফুটপাতের কিনারা ঘেঁষে একটা গাড়ি থামল, ভেতরটা অন্ধকার, কিন্তু কেউ নামল না। বুদের দু'পাশে দোকানদাররা অ্যাথেনার প্লাস্টিক মূর্তি থেকে শুরু করে তেলে ভাজা পিঠা, লাইটার, ট্র্যানজিসটর রেডিও ইত্যাদি বিক্রি করছে।

'মাসুদ ভাই, আপনি বরং আমার বাড়িতে চলে আসুন। প্রীতি বলছে, ডিনারটা আপনি আমাদের সাথে খাবেন।'

'ধন্যবাদ, চন্দন। না।'

'না কেন, মাসুদ ভাই? হাতে তো অনেক সময়। অ্যাক্রোপলিস-এ আরেক পার্টির সাথে আমাদের দেখা হবে রাত এগারোটায়। অ্যাক্রোপলিস খোলা থাকে মাঝরাত পর্যন্ত। আজ চাঁদ থাকবে, কাজেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারব আমরা। মাঝখানের সময়টা আপনি...'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করব,' শান্তসুরে বলল রানা, আউটডোর কাফেতে বসা ট্যুরিস্টদের ওপর চোখ বোলাচ্ছে ও। লোকজনের ভিড় থাকায় জায়গাটাকে নিরাপদ বলে মনে হলো ওর। প্রতিপক্ষ, তাদের পরিচয় যা-ই হোক, এত সাক্ষী রেখে

কোন ঘটনা ঘটাতে সাহস পাবে না। অন্ধকার গাড়িটা থেকে জড়াজড়ি করে নামল একজোড়া ছেলেমেয়ে, চুমো খাচ্ছে।

হতাশ সুরে চন্দন বলল, 'তাহলে আমিই আসছি। মিটিং শুরু হবার আগে আপনার সাথে কথা হওয়া দরকার।'

'বেশ,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

চৌরাস্তার এক ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

গাছপালা আর আলোকিত কৃত্রিম ঝর্নার মাঝখানে রাস্তা ও ফুটপাত। মৃদুমন্দ বাতাস থাকলেও বেশ গরম লাগছে ওর। ঝর্না থেকে ভেসে আসা পাউডারের মত পানির কণাগুলো ঠোঁটে আর মুখে শীতল পরশ বুলিয়ে দিল। বগলের নিচে .৩৮ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা না থাকলে জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলতে পারত ও। ওর মুখের সামনে, প্রায় হামলা করার ভঙ্গিতে, পাঁচ-সাতটা চকচকে ছোরা নাচাল এক ফেরিওয়ালা। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল ও, 'লাগবে না!'

ফুটপাতের ওপর নেমে এসেছে অনেক রেস্তোরাঁ, খানিক ঘোরাঘুরি করার পর খালি একটা টেবিলে বসল রানা। হোটেলের প্রবেশপথে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে বারবণিতারা, খোলা দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের নধর নগ্ন পা।

আশপাশের টেবিলে সবাই মদ নিয়ে বসেছে। কফির অর্ডার দিল রানা। প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশি তাকিয়ে থাকল ওয়েটার ওর দিকে, তবে কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না। পর পর দু'কাপ কফি শেষ করল রানা, চন্দন পৌঁছুল পৌনে এক ঘণ্টা পর। মনে মনে একটা ব্যাখ্যা আশা করছে রানা। এত দেরি হলো কেন?

রানার মতই ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল তার, গোঁফ জোড়া

লালচে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো এত উজ্জ্বল যে মনে হয় সব সময় হাসছে। আচরণ ও চেহারা, দুটোই কোমল, কিন্তু প্রয়োজনে নির্দয় কঠোর হয়ে উঠতে জানে। ধূসর সুট আর সাদা শার্ট পরে এসেছে সে, টাইটা নীলচে কালো। গ্রীকদের মতই ঢক ঢক করে মদ খেতে অভ্যস্ত চন্দন, কিন্তু এই মুহূর্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সে-ও। রানার সামনে মদ তো দূরের কথা, সিগারেটও খায় না।

আশপাশের টেবিল আর লোকজনের ওপর চোখ রেখে কথা বলল রানা, 'সাথে কোন ছায়া নিয়ে আসোনি তো? ভাল করে দেখেছ?'

বিনয় আর শ্রদ্ধার সাথে জবাব দিল চন্দন, 'দেখেছি, মাসুদ ভাই। কেউ ফলো করেনি। দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। প্ল্যানটা আবার বদল করতে হয়েছে।' রুমাল দিয়ে হাতের তালু মুছল সে। 'মিটিঙের সময় প্রথমে পিছিয়ে দিতে চাইছিল ওরা, এখন তাড়াহুড়ো করছে।'

'আমি তৈরি,' বলল রানা। 'অ্যাক্রোপলিস বেশি দূরে নয়, হেঁটেই যেতে পারি আমরা।'

'হাতে খানিকটা সময় আছে। মাসুদ ভাই, আপনি নিকোলাই প্যাসিমভ-এর নাম শুনেছেন?'

রানার চোখ দুটো ছোট হলো। 'রুশ ভিন্নমতাবলম্বীদের নেতা?'

'জ্বী।'

'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর পণ্ডিত। পঞ্চাশ বা একান্ন বছর বয়স। চিরকুমার। সাদা পতাকা নামে একটা বিজ্ঞান গবেষক সমিতির চেয়ারম্যান। সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গবেষণার কাজে ও সামরিক ব্যবহারে সমিতির বিজ্ঞানীরা হাই-এনার্জি,

সাবঅ্যাটোমিক পার্টিকেলস-এর সফল প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছেন। অসংখ্য কাজে লাগবে এই আবিষ্কার। এ-ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ এগোতে পারেনি। নিকোলাই প্যাসিমভকে অনেক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। নোবেল প্রাইজের জন্যেও মনোনয়ন দান করা হয়েছে তাকে। কিন্তু তারপর...'

'তারপরই সব এলোমেলো হয়ে যায়,' বলল চন্দন। 'তিনি মনে করলেন, বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলার অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু রাজনীতিকরা তাঁকে মুখ খুলতে দিতে রাজি হলেন না।'

'শুনেছি, তাঁর কথা হলো, বিজ্ঞানকে শুধু শান্তির কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই নীতি প্রচারের জন্যে ইউরোপ যেতে চেয়েছিলেন তিনি। আমেরিকা তাঁকে লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে নিতে পারে, এই ভয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেশ ত্যাগের অনুমতি দেয়নি। তাছাড়া, রাশিয়ায় তাঁর ভালই দিন কাটছে বলে শুনেছি। নতুন কি ঘটল?'

'তিনি বেরিয়ে আসছেন,' বলল চন্দন।

'তাঁকে নিশ্চয়ই বহিষ্কার করা হয়নি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল চন্দন। 'রাষ্ট্রীয় অনেক গোপন রহস্য জানেন তিনি, রাশিয়ানরা তাঁকে বহিষ্কার করার কথা ভাবতেই পারে না।'

'তারমানে কি, তিনি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করছেন? পালিয়ে আসছেন রাশিয়া থেকে?' কঠোর হলো রানার চেহারা। 'তা যদি হয়, তাঁকে সাহায্য করার মানে দাঁড়াবে পশ্চিমাদের সাহায্য করা। নীতিগতভাবে আমরা তা করতে পারি না।'

'ব্যাপারটা সে-পর্যায়ে নেই, মাসুদ ভাই,' শান্তসুরে বলল চন্দন। 'বেরিয়ে আসার জন্যে তাঁর কোন সাহায্য দরকার নেই,

কারণ এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। শুধু...'

'শুধু কি?' বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধ করছে রানা।

'দুঃখিত। ঠিক আছে।' দু'হাত এক করে ঘষল চন্দন, দ্রুত চারপাশে চোখ বোলাল। 'তিনি হারিয়ে গেছেন, মাসুদ ভাই। কেউ জানে না কোথায় আছেন তিনি বা কি ঘটেছে তাঁর কপালে।'

'মানে?'

'একটা ফ্রেইটার-এ ছিলেন তিনি। জাহাজটার নাম নেমিসিস, মালিক একজন গ্রীক। জাহাজটা ওডেসায় থাকতে চুপিসারে তাতে ওঠেন তিনি। পুরো জাহাজটাই নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'কিন্তু আমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছি?' চাপা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন।

'কারা সাহায্য চেয়েছে?' জানতে চাইল রানা। 'কে.জি.বি.?'

'একা শুধু কে.জি.বি. নয়,' বলল চন্দন। 'সাহায্য চেয়েছে সি.আই.এ-ও। তবে বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার কে.জি.বি. বা সি.আই.এ. সম্পর্কে ততটা ভাবছে না। ভাবছে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর আবেদন সম্পর্কে। নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে বের করার জন্যে তারা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস সম্পর্কে জানেন আপনি, মাসুদ ভাই? ওটা একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন।'

ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যে ওয়াইনের অর্ডার দিল রানা। সব কথা পরিষ্কার করে বলছে না চন্দন, কিংবা হয়তো ভেবেছে কিছু ব্যাপার পরে ব্যাখ্যা করবে। সি.আই.এ-র কথা আলাদা, কিন্তু হেডকোয়ার্টার কে.জি.বি-র আবেদনে সাড়া দেয়ার কথা ভাবছে না কেন? হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস-এর কথা শুনেছে

রানা। আন্তর্জাতিক একটা সংস্থা, দাতাদের চাঁদায় কাজ চালায়। মানবাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে কাজ করছে। ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশে ওদের শাখা আছে। গত বছর চিলিতে একটা আন্দোলন গড়ে তোলে এইচআরসি, ফলে চিলি সরকার বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। 'আমার ধারণা ছিল,' বলল রানা, 'ওরা শুধু তৃতীয় বিশ্বেই কাজ করে। আমেরিকা বা ইউরোপের সাথে রাশিয়ার উত্তেজনা বাড়ে, এমন কিছুতে নাক গলাতে গেল কেন? আমি ধরেই নিচ্ছি, ওদের প্ররোচনাতেই রাশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন নিকোলাই প্যাসিমভ।'

'হ্যাঁ, ওরা সাহায্য করেছে।'

'আমরা যখন জানি, ধরে নিতে হয় রাশিয়ানরাও জানে,' বলল রানা।

'ধরে নিতে হয়,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল চন্দন।

'হারিয়ে গেছেন ভদ্রলোক? হারিয়ে গেছেন, সেই সাথে হাসির খোরাক হয়েছেন,' রাগের সাথে বলল রানা। 'সি.আই.এ. কি বলতে চায়?' জানতে চাইল ও।

'স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটার পর প্রকাশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছে না সি.আই.এ,' বলল চন্দন।

'ভাব দেখাচ্ছে, নিকোলাই প্যাসিমভের ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। সরাসরি নাক গলাতে পারছে না, তাই তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছে ঢাকায়—বাংলাদেশকে গার্মেন্টস-এর কোটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে কংগ্রেসকে অনুরোধ করবে তারা, বিনিময়ে নিকোলাই প্যাসিমভকে বি.সি.আই. তুলে দেবে তাদের মনোনীত এজেন্টের হাতে।'

'নিশ্চয়ই খুব কড়া ভাষায়...'

'তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে,' বলল চন্দন।

'তারমানে অবশ্য এই নয় যে মাঠ থেকে সরে যাবে ওরা,' চিন্তিতসুরে বলল রানা।

'না, তা যাবে না,' বলল চন্দন। 'এই অ্যাসাইনমেন্টে ওদেরকে আপনি শত্রুর তালিকায় রাখতে পারেন।'

'সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে কে.জি.বি-ও,' বলল রানা। 'এ-ব্যাপারে আমরা কিভাবে সাড়া দিচ্ছি?'

'কে.জি.বি-র প্রস্তাবটাকেও ঢাকা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি,' বলল চন্দন।

'কেন?'

'ঢাকার ধারণা হয়েছে, কে.জি.বি. আবেদন না জানালে ব্যাপারটা উদ্ভট লাগত, তাই আবেদন জানানো হয়েছে।'

'এরকম ধারণা কেন হলো?'

'দুটো কারণে,' বলল চন্দন। 'নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায় ছিলেন, কেন পালালেন, কিভাবে পালালেন, এ-সব ব্যাপারে তারা কোন তথ্য দিতে পারেনি, বা দিতে চায়নি। আরেকটা ব্যাপার হলো, বি.সি.আই-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা করার জন্যে কে.জি.বি-র তরফ থেকে তারা নির্বাচিত করেছে কর্নেল রুস্তমভকে।'

জেড ক্লিয়ার‍্যান্স দেয়ার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কর্নেল রুস্তমভ, রানার ব্যক্তিগত শত্রু। এমনকি রানা যখন বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে রাশিয়াকে সাহায্য করতে গেছে, তখনও লোকটা ওকে সহ্য করতে পারেনি। তার ধারণা, রানা আসলে আমেরিকান চর। সেনাবাহিনীর লোক সে, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিল, পরে

কে.জি.বি-তে যোগ দেয়। রানার সাথে কয়েকবারই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে তার, প্রতিবারই অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে রানা। শেষবার রানাকে হুমকি দিয়েছিল সে, মাটির বুকে রুস্তমভ আর রানা দু'জন একসাথে বসবাস করতে পারবে না, একজনকে বিদায় নিতে হবে। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, ওদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। রানার প্রতি তার অকারণ বিদ্বেষ সম্পর্কে জানতে পেরে কে.জি.বি-কে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল বি.সি.আই, ভবিষ্যতে কোন সহযোগিতা দরকার হলে তারা যেন কর্নেল রুস্তমভকে প্রতিনিধিদলে স্থান না দেয়।

দেখা যাচ্ছে, বি.সি.আই-এর অনুরোধ কে.জি.বি. কানে তোলেনি।

কেন? কারণটা কি? তারমানে কি নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজে পাবার জন্যে আসলে বি.সি.আই-এর সাহায্য দরকার নেই কে. জি.বি-র?

পরিস্থিতিটা জটিল লাগল রানার। চিন্তা-ভাবনা করছে, তবু লক্ষ করল লটারির টিকেট নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে এক লোক। হাত নেড়ে তাকে তফাতে থাকার ইঙ্গিত দিল ও। নিকোলাই প্যাসিমভ রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে ভাল করেছেন কি খারাপ করেছেন সেটা বিচার করা ওর দায়িত্ব নয়। তবে ভদ্রলোকের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিলে, শেষ পর্যন্ত মানবকল্যাণের জন্যে সেটা ক্ষতিকরই হবে। বি.সি.আই. তা ঘটতে দিতে পারে না। অন্তত সে-ধরনের কিছু যাতে না ঘটে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে রানা। ভদ্রলোককে সাহায্য করতে হলে আগে জানতে হবে, কোথায় আছেন তিনি।

ইতোমধ্যে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। মাউন্ট লাইসাবেটাস-এর চূড়াটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার লোভে চৌরাস্তায় ট্যুরিস্টদের ভিড় আরও বেড়েছে। চারদিকে শোরগোল।

চন্দন বলল, 'এইচআরসি-র কাজে নাক না গলালেও, নেমিসিস-এর ওপর নজর রাখছিল সি.আই.এ.। জাহাজটা গ্রীক জলসীমায় আসার পর গ্রীক ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্য চায় ওরা। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু করিন্থ ক্যানেল-এ জাহাজটা পৌঁছুল না। আগাম কোন লক্ষণ প্রকাশ না করে অদৃশ্য হয়ে গেছে নেমিসিস।'

'যতটুকু শুনেছি, নিকোলাই প্যাসিমভ শুধু দেশপ্রেমিক নন,' বলল রানা, 'কমিউনিজমের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা রয়েছে। কোন কারণে তিনি যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেও থাকেন, পশ্চিমাজগতের সাথে তিনি সহযোগিতা করতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। এইচআরসি তাঁকে কোথায় নিয়ে রাখতে চায়, জানো?'

'সম্ভবত সুইডেনে,' বলল চন্দন। 'আপনার অ্যাসাইনমেন্ট হলো, ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বি.সি.আই. সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল বলে মনে না হলে তাঁকে আমরা কে.জি.বি-র হাতেও তুলে দেব না, সি.আই.এ-র হাতে তো নয়ই। আরেকটা কথা, মাসুদ ভাই–হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি। এমন কি এইচআরসি-র আবেদনও আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।'

'রুস্তমভকে যতটুকু চিনি আমি,' বলল রানা, 'কথা না শুনলে নিকোলাই প্যাসিমভকে মেরে ফেলতে পারে সে।'

'ভদ্রলোককে বাঁচানোর আশা একেবারে যে নেই তা নয়,' বলল চন্দন। 'জলপরী নামে একটা মেমো এসেছে আমাদের

হাতে। অ্যাক্রোপলিসে গিয়ে আলোচনা হবে। চলুন, ওঠা যাক।'

'আমি তোমার পিছু নেব,' বলল রানা।

'জ্বী, সাবধানের মার নেই।'

সার সার এয়ারলাইন্স অফিস আর চোখ-ঝলসানো দোকানপাট পিছনে রেখে আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর কাছাকাছি চলে এল ওরা, ব্যাংকটার পাশের একটা গলি ধরে উঠল মেট্রোপলিয়স স্ট্রীটে, রানার বিশগজ সামনে রয়েছে চন্দন। ক্যাথেড্রালটা পেরিয়ে এসেই বাঁক নিয়ে মিনিসিকলিয়স স্ট্রীটে ঢুকল সে। রাস্তাটা অত্যন্ত সরু, যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। এটা ধরে বোহেমিয়ান প্লাকা ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ এথেন্সের সবচেয়ে পুরানো এলাকায় যাওয়া যায়। প্লাকা ডিস্ট্রিক্ট আর অ্যাক্রোপলিসের মাঝখানে অনেকগুলো মন্দির রয়েছে। খানিক পর পর তাঁবু আকৃতির রেস্তোরাঁ, ভেতরটা পাহাড়ী গুহার মত দেখতে, কান-ফাটানো মার্কিন পপ সঙ্গীত ভেসে আসছে বাইরে। কয়লা আর ঝলসানো অক্টোপাসের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। আঙুর গাছের পর্দা দিয়ে ঘেরা কিছু টেরেস দেখা গেল, ওগুলোও রেস্তোরাঁ। অনেক বাড়ির খোলা ছাদেও চেয়ার-টেবিল ফেলে ব্যবসাটা জমিয়ে তোলা হয়েছে। এথেন্সবাসীদের একটা অভ্যেস, অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে, খাওয়ার ঝামেলা সারবে বাইরে। ফেরিওয়ালাদের জ্বালায় ফুটপাত ধরে হাঁটা মুশকিল। এত লোক, এত ব্যস্ততা, তবু শহরটা অত্যন্ত পরিষ্কার। গোটা পরিবেশে একটা উৎসব উৎসব ভাব রয়েছে। সুদর্শন যুবকরা ঘুরঘুর করছে নিঃসঙ্গ যুবতীর খোঁজে।

ভিড়ের ভেতর একটা ছায়ার মত এগোল রানা। সিনটাগমা স্কয়্যার থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে ওদেরকে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে চন্দনের কাছাকাছি চলে এল রানা, আঙুলের টোকা দিয়ে খুচরো একটা পয়সা ছুঁড়ে মারল তার পিঠে। চোখাচোখি হতে পিছন দিকে ইঙ্গিত করল ও।

ছোট্ট এক রেস্তোরাঁর দিকে এগোল চন্দন, জানালায় সাঁটা মেন্যু পড়ার ভান করল। দরজার পাশে ঝলসানো হচ্ছে আস্ত ভেড়া, মশলার ঝাঁঝ জিভে পানি এনে দিল। চন্দনের পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'ও কিছু না, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'ও আমাদের আবুল খায়ের, দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসার।'

মেন্যুর দিকে চোখ তুলল রানা। 'এখানে কি করছে ও?'

'আমিই বলেছিলাম, আমাদের পিছনে যেন নজর রাখে।'

'সবাইকে জানান দিয়ে কাজটা করছে ও।'

'সামনে আরও দু'জন আছে,' বলল চন্দন। 'ভিড়ের ওপর নজর রাখছে।'

'কি ব্যাপার, এ তো দেখছি গোলাপ শাহ্ মাজারে সমাবেশ!'

হাসল চন্দন, তবে গলার সুরটা থমথমে, 'এইচআরসি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না, হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ।'

'মিটিংটা তাহলে তাঁদের সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল চন্দন। 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসে আমাদের চীফের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন, মাসুদ ভাই। তাঁদের কারও কোন ক্ষতি হলে আমার ক্যারিয়ার শেষ।'

বেশ খানিকক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। ঠোঙা ভর্তি কাবাব না কি যেন কিনেছে আবুল খায়ের, একটা অ্যান্টিক স্টোর-এর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নাড়ছে

আর পথচারী মেয়েদের নিতম্ব দেখছে। দোকানের শোকেসে সাজানো রয়েছে রাজ্যের ছুরি আর কাঁচি। রানা সিদ্ধান্ত নিল, আবুলকে চন্দনের দরকার মনে হয়ে থাকলে, ওরা দু'জন একসাথে থাকুক। 'এখান থেকে তুমি আমার পিছু নাও,' বলল ও, শহরটা ওর অপরিচিত নয়।

দুই প্রস্থ চওড়া পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা, ডানদিকে ঘুরে একটা রাস্তায় পড়তেই প্রাচীন থিয়েটারটা দেখা গেল। একশো ষাট খ্রিস্টাব্দে হেরোড অ্যাটিকাস তাঁর স্ত্রী রেজিলার স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন এটা। অ্যাক্রোপলিস প্রবেশ পথের নিচে অনেক ট্যাক্সি আর ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। চাকা লাগানো রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যান্ট আর স্যুভেনির বুদগুলো চারপাশের পরিবেশে একটা মেলার ভাব এনে দিয়েছে। চন্দনের জন্যে অপেক্ষা করল রানা। দু'জন একসাথে প্রপাইলিয়ার ভেতর দিয়ে ঢুকল, অ্যাথেনা নাইক-এর মন্দির ডানে রেখে।

অনুসরণরত ছায়ামূর্তিদের উদ্দেশে একজন ট্যুর গাইড অনর্গল কথা বলছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়, মেয়েটার শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি নেই। 'সংরক্ষণের স্বার্থে অনেক কিছু মেরামত করতে হয়েছে এখানে। প্রপাইলিয়া, বা মিছিল নিয়ে প্রবেশ করা পথটা খুলে দেয়া হয় খ্রিস্টপূর্ব চারশো বিরাশি সালে, ষোলোশো ছাপান্ন সাল পর্যন্ত খোলা ছিল। কিন্তু তারপর, দিমিত্রিওস-এর ছোট্ট চার্চ আর অ্যাক্রোপলিস-এর গোড়া লক্ষ্য করে কামান দাগলেন তুর্কী গভর্নর, কারণ উৎসবের শোরগোল তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। কামানের গোলা সম্ভবত প্রপাইলিয়ায় আঘাত করে, যদিও কিংবদন্তী হলো, সাধু নাকি জিয়াস-এর কাছে আবেদন জানান, প্রতিশোধ হিসেবে

বজ্রাঘাত করা হোক। তবে তুর্কীরা যে প্রপাইলিয়ায় তাদের গোলা-বারুদ রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন কারণেই হোক সেখানে আগুন ধরে যায়।' সরে যাচ্ছে রানা, শুনতে পেল মেয়েটা আরও বলছে, 'আঠারোশো সাতষট্টি সালে অ্যাথেনা নাইক-এর ছোট মন্দিরটা ভেঙে ফেলে তুর্কীরা, একটা কামান বসানোর জায়গা করার জন্যে।'

অ্যাক্রোপলিস বা নগরদুর্গের বিশাল পাথুরে শরীরে অসংখ্য দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। চারদিকের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা মার্বেল। বিভিন্ন ভাষার বিস্ময়সূচক ধ্বনি শোনা গেল। চাঁদের আলোয় পথ দেখে কয়েকশো লোক এগিয়ে চলেছে। এদিকে আলোর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি, সিগারেটের আগুন আর নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে।

দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দন, ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল, 'মাসুদ ভাই, আবুলকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'প্রশ্ন হলো, সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে কিনা,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা।

'চলুন, সামনে এগোনো যাক।'

ধোঁয়াটে চাঁদের আলোয় পার্থেননের ছাল ওঠা স্তম্ভগুলো বিশাল এক একটা দৈত্যের মত লাগল। পাথর কেটে তৈরি করা কিছু কিছু নকশা আজও অক্ষত রয়েছে। গোটা ভবনটা আড়াই হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

ওকে একটা পাঁচিলের কাছে টেনে নিয়ে এল চন্দন, ওপারে এথেন্স নগরী দেখা যায়—সেই লাইসাবেটাস পর্যন্ত শহরটা যেন আলো ঝলমলে একটা চাদর। এখানে অপেক্ষা করছেন এক

ভদ্রলোক, চন্দন পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোকের নাম সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। এইচআরসি-র বর্তমান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। ভদ্রলোক অস্বাভাবিক লম্বা, তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাতে হলো রানাকে। চওড়া কাঠামো শরীরের, অ্যাথলেটিক, ষাট-পয়ঁষট্টি বছর বয়সেও তরবারির মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন।

নামটা আগেও শুনেছে রানা। সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার সোনার চামচ মুখে নিয়ে সুইডেনে জন্মেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে শত বছরের পুরানো একটা স্টীল মিলের মালিক তিনি। কোন কালেই পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না, তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগের কল্যাণে মন্ত্রীসভার সদস্য বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা হবার সবিনয় প্রস্তাব দেয়া হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে দু'বার তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন, বছর তিনেক জাতিসংঘে সুইডেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পরে বিশ্বব্যাংকের অন্যতম কর্মকর্তা হন। ভদ্রলোকের হাবভাবের মধ্যে রাজকীয় একটা ভঙ্গি আছে, যেন তাঁর অঙ্গুলিহেলনে সবাই নাচবে।

'মি. জর্জকে দেখছি না যে?' পরিচয় পর্ব সেরে জিজ্ঞেস করল চন্দন।

'সম্ভবত কাউন্টেস সেলিনাভানটিনোস তাকে আটকে রেখেছেন,' বললেন বারকেইনহেইমার, তাঁর ইংরেজি নির্ভুল। 'দোরগোড়ায় এত কথা বলতে পারেন ভদ্রমহিলা, বিশেষ করে কেউ যখন তাঁর পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে! মাঝরাতের আগে তো বিদায় নেয়ার সাহসই পায় না কেউ। তবে এ-ও সত্যি যে ভদ্রমহিলা পুরুষদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টিতে দারুণ দক্ষ—যদি বুঝে থাকেন ঠিক কি বলতে চাইছি—অনেকেরই চলে আসতে ইচ্ছে করে

না।' চাঁদের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ঠোঁটে হাসি ভৌতিক লাগল রানার।

চন্দনের দিকে তাকাল ও।

হাসল চন্দন। বারকেইনহেইমারকে বলল ও, 'তাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুরু করি, ব্যাপারটা কেমন হবে?'

'সেটাই ভাল হবে,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' তাড়াতাড়ি বললেন সোরেৎসেন বারকেইনহেইমার। 'বেশ তো। মি. রানা, আশা করি আপনি আমাদের সংস্থার লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত আছেন?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

একটা আঙুল খাড়া করলেন বারকেইনহেইমার, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, 'যে সরকার তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। চলতি বছর আমরা নজর দিয়েছি সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে...'

'চলতি বছর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর গত বছর?'

'চিলি। উগান্ডা।'

'আগামী বছর?'

চট করে একবার চন্দনের দিকে তাকালেন বারকেইনহেইমার। রানার হাবভাব ও কণ্ঠস্বর অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে চন্দনকে। 'যেখানে আমাদেরকে ডাকা হবে,' বললেন এইচআরসি কর্মকর্তা।

চন্দনের দু'জন সিকিউরিটি এজেন্ট কয়েক ফুট দূরে হাঁটাহাঁটি করছে, ট্যুরিস্টরা কেউ তিন জনের ছোট্ট দলটার কাছাকাছি চলে এলে তাদের সাথে মিশে যাচ্ছে দ্রুত। আবুল খায়ের কোথায় থাকতে পারে ভেবে পেল না রানা। 'রাশিয়ান ভিন্নমতাবলম্বী

নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে বলুন,’ তাগাদা দিল ও।

‘ইয়েস, ওহ্ ইয়েস!’ মাথা ঝাঁকালেন বারকেইনহেইমার। ‘মি. প্যাসিমভ যে-কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হতে যাচ্ছিলেন। আমরা যে মানবাধিকার রক্ষায় আন্তরিক, সেটা শুধু কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করার এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।’

‘কিন্তু শুরুতেই ব্যাপারটা কেঁচে গেল, তাই না?’

উত্তর এল ওর পিছন দিক থেকে, নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, লোকটা যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে, ‘তাই কি? তবে, তা যদি হয়ও, যদি ব্যাপারটা কেঁচেও গিয়ে থাকে, এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। মি. মাসুদ রানার আকৃতি নিয়ে পৌঁছে গেছে ত্রাণকর্তা। সব যে আবার ঠিক হয়ে যাবে, এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।’

ঝট করে আধপাক ঘুরে ডাচ জর্জকে দেখতে পেল রানা, সাথে চন্দনের একজন সিকিউরিটি এজেন্ট রয়েছে। লোকটা কথা বলল সামান্য চড়া গলায়। মদ খেয়েছে কিনা সন্দেহ হলো রানার। লম্বা সিগারেটে দীর্ঘ টান পড়ায় আলোকিত হয়ে উঠল ডাচ জর্জের চেহারা। সরু, লম্বাটে মুখ। সরু গোঁফ, যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা। ভারি, ঢুলুঢুলু চোখ, ভুরু জোড়ার একটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। তার মুখের তীক্ষ্ণ হাড়গুলো চেহারায় বাজপাখির মত একটা ভাব এনে দিয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, অস্বাভাবিক লম্বা, কাঁধের দু’দিকে এমনভাবে ফুলেফেঁপে আছে ঠিক যেন পাখির একজোড়া ডানা। তবে করমর্দনের সময় টের পেল রানা, লোকটার মুঠোয় জোর আছে।

ডাচ জর্জ সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানা আছে রানার। যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার

অভিযোগে তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে সুইডেনে আশ্রয় নেয় সে। ডাচ জর্জ যুদ্ধবিরোধী মনোভাব পোষণ করলে কি হবে, তাদের পারিবারিক কেমিকেল কোম্পানী রাসায়নিক মারণাস্ত্র তৈরি করে।

'মি. জর্জ এইচআরসি-র ভূমধ্যসাগর এলাকার কোঅর্ডিনেটর,' বললেন বারকেইনহেইমার।

'প্যাসিমভের ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল।'

'প্লিজ!' রানার সামনে একটা হাত তুলে নাড়ল ডাচ জর্জ, ঘন ঘন কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত জায়গা বদল করার একটা অভ্যেস রয়েছে তার, যেন প্রাণশক্তি ধরে রাখতে পারছে না। 'প্লিজ, ভাই! তার সম্পর্কে পাস্ট টেন্স-এ কথা বোলো না! পুঁজি হিসেবে সময় আর টাকা খাটাবার পর সেটা জলে গেছে, এ আমি ভাবতে পারি না। মি. প্যাসিমভের জন্যে দুটোই ইনভেস্ট করেছি আমরা।'

বারকেইনহেইমার বললেন, 'আমাদের তরফ থেকে অপারেশন-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মি. জর্জকে।'

জর্জ বলল, 'আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ভদ্রলোককে সাফল্যের সাথে নেমিসিসে তুলে দেয়া হয়।'

'কি করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রেডিও মেসেজ থেকে,' বলল জর্জ। 'পাঠিয়েছে এডওয়ার্ড গ্রীন। গ্রীন আমাদের অপারেটর। জাহাজেই থাকার কথা তার। মেসেজটা অবশ্যই কোড করা ছিল।'

'তা জেনে আর লাভ কি,' বলল রানা, 'জাহাজটাই যখন গায়েব হয়ে গেছে।'

'তুমি হতাশাবাদী, এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?' বিস্ময়

প্রকাশ করল জর্জ।

‘আশাবাদী হওয়ার কারণ দেখাও,’ আহ্বান জানাল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে জায়গা বদল করল ডাচ জর্জ। ‘দায়িত্বটা তো তোমার, তুমি আমাদেরকে আশার আলো দেখাবে,’ বলল সে। ‘আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, বি.সি.আই. তার সেরা এজেন্টকে পাঠাচ্ছে...’

তাকে বাধা দিল চন্দন, ‘জলপরী মেমোর কথাটা বলতে দিন আমাকে, মি. জর্জ। মাসুদ ভাই, ওটা নেমিসিস লগ-এর একটা পাতা। স্রোতের সাথে ভেসে রোডস আইল্যান্ডে চলে আসে।’ বিরতি নিয়ে দ্রুত শ্বাস টানল সে। কৃষ্ণ সাগর থেকে ইটালি যাওয়ার কথা নেমিসিসের, রোডস-এর ত্রিসীমানায় ওটার আসার কথা নয়। তারমানে নিশ্চয়ই ওটার দিক পরিবর্তন করা হয়েছে। লগটা জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে, দিক বদলানোর ব্যাপারটা গোপন করার জন্যে ওটার বদলে জাল লগ ব্যবহার করা হয়েছে।’

‘পেল কে?’ জানতে চাইল রানা।

‘পুল...হ্যাঁ, পুলটিস। মিলি পুলটিস নামে একটা মেয়ে।’

‘কে সে? কি জানো তার সম্পর্কে?’

‘খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তার সম্পর্কে মি. জর্জ আপনাকে সব বলবেন, মাসুদ ভাই,’ দ্রুত বলে যাচ্ছে চন্দন। ‘জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ভেবে পাতাটা পুলিসের হাতে তুলে দেয় মিলি। পুলিস বিভাগে গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের লোক আছে, তারা জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারে। এইচআরসি-র তরফ থেকে আগেই গ্রীক ইন্টেলিজেন্সকে নেমিসিস রহস্য সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। লগের পাতা পাওয়া গেছে শুনে এইচআরসি আবার

আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, আমরা যোগাযোগ করি গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের সাথে।'

'বুঝলাম, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের সমস্যা এখন আমাদের ঘাড়ে,' মন্তব্য করল রানা।

মুখ হাঁড়ি করে ডাচ জর্জ বলল, 'দেখো, ব্যাপারটা তোমরা এভাবে না দেখে...'

রানা তাকে থামিয়ে দিল, 'লগের পাতায় কি আছে?'

'রুটিন এন্ট্রি,' বলল চন্দন। 'তবে যেদিন ওটা পাওয়া গেছে তার আগের দিনের জাহাজের পজিশন সম্পর্কে একটা নোট আছে। পজিশনটা হলো, দ্বীপটার আটান্ন নটিক্যাল মাইল উত্তর।'

আধো অন্ধকার রাত ভেদ করে দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি, পশ্চিম দিকের পাথুরে পাহাড়টার ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। ওই পাহাড়টার ওপর, জানে ও, প্রাচীন গ্রীসের সবচেয়ে বড় আদালতের অধিবেশন বসত। ওখানে দাঁড়িয়ে সেইন্ট পল এথেনিয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন।

জর্জ বলল, 'পাতাটা পাওয়া গেছে, এটাই বড় কথা। জাহাজটা যে এদিকে ছিল, এটা পরিষ্কার। কে জানে, মি. প্যাসিমভ হয়তো রোডসেই আছেন।'

'এর আরেকটা অর্থ হতে পারে,' বলল রানা, 'জাহাজটা ডুবে গেছে। পাতাটা হয়তো তারই শেষ চিহ্ন।'

'কিন্তু অন্য কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি,' বলল চন্দন। 'প্লেন নিয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছে, ফলাফল নেগেটিভ।'

বারকেইনহেইমার রানাকে বললেন, 'আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলে অ্যাসাইনমেন্টটা আপনি গ্রহণ না-ও করতে পারেন। প্লিজ, মি. রানা, সেরকম কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। মি.

প্যাসিমভকে যদি উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, এইচআরসি-র সুনাম বলে আর কিছু থাকবে না।'

মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলল রানা, 'এইচআরসি তার সাধ্যের বাইরে নাক গলায়। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি, কারণ বিপদটা আসলে মি. প্যাসিমভের।' অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রহণ করার পিছনে এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু আরও বড় কারণ হলো গোটা ব্যাপারটার মধ্যে গোপন কি যেন একটা আছে বলে সন্দেহ হয়েছে রানার। বিশেষ করে কে.জি.বি-র ভূমিকা রীতিমত রহস্যময়।

'তোমার সম্পর্কে কিংবদন্তীগুলো তাহলে মিথ্যে নয়,' বলল ডাচ জর্জ। 'আমি জানতাম, কৃতিত্ব দেখাবার এই সুবর্ণ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে না।'

'শুধু কৃতিত্ব বললে ভুল হবে, চাল ব্যর্থ করার সুযোগও আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না,' ডাচ জর্জের দিকে পলকহীন চোখে তাকাল রানা।

মাঝখান থেকে কথা বলল চন্দন, 'মাসুদ ভাই, এখান থেকে সরাসরি আপনি রোডস আইল্যান্ডে চলে যাবেন। আজ রাতে, পরে এক সময়, মি. জর্জ আপনার সাথে দেখা করবেন ওখানে, খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় তখন আপনি ওর কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন। উনি আপনার এইচআরসি কনট্যাক্ট।'

'নো অফেন্স, তবে একা কাজ করব আমি,' বলল রানা।

'মুখে বলছ নো অফেন্স, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল ঠিক উল্টো,' সহাস্যে বলল ডাচ জর্জ, তার হাসির শব্দে ক্ষীণ ব্যঙ্গের সুর বাজল। 'তবে আমি কিছু মনে করছি না। গুঁতো খেতে আমার ভালই লাগে।'

চন্দনের দিকে কঠিন চোখে তাকাল রানা। 'অসহ্য!'

হাসিভরা চোখ দুটো কোটরের ভেতর ঘোরাল চন্দন। 'আয়োজনটা এভাবেই করা হয়েছে, মাসুদ ভাই–ওপরমহল থেকে। এই পর্যায়ে তা আর বদলানো সম্ভব নয়।'

'সবচেয়ে আগে আমি যেটা জানতে চাই,' বারকেইনহেইমার আর ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা। 'নতুন ডেভলপমেন্ট সম্পর্কে আপনারা কাউকে কিছু বলেছেন কিনা?'

'না!' আঁতকে উঠে বললেন বারকেইনহেইমার।

'কেন বলতে যাব, ডিয়ার ফেলো!' বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ।

'ভাল।' বড় করে শ্বাস টানল রানা। 'এটা আমাদের সিক্রেট, কেমন? তা না হলে...'

ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দনের একজন সিকিউরিটি এজেন্ট এক পা এগিয়ে রানার সামনে চলে এল, অকস্মাৎ ঝাঁকি খেলো সে, মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল শরীরটা, টলমল করে ছোট্ট দলটার দিকে এগোল। লোকটার মুখ নিঃশব্দে নড়ছে দেখে ঘাড়ের পিছনে শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ দুটো অথচ দেখা যাচ্ছে শুধু চোখের সাদা অংশটুকু। তার বুকের সামনে শার্টে এবড়োখেবড়ো একটা গাঢ় দাগ ফুটছে। দ্বিতীয় গুলিটা পাঁচিল থেকে ধুলো ওড়াল। রানার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ডাচ জর্জকে ফেলে দিল রানা, ডাইভ দেয়ার সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখল ক্ষমা না চেয়ে চন্দনও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে বারকেইনহেইমারকে।

ডাইভ দিল রানা বাম দিকে। তিরিশ ফুট সামনে, ওদিক থেকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। তার হাতে সাইলেন্সার লাগানো

একটা পিস্তল। লম্বা করা হাতে পিস্তলটা ধরে আছে সে। লোকটা আবুল খায়ের। দৃঢ়, সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে, একের পর এক গুলি করছে। আকস্মিক হামলা চালিয়ে হকচকিয়ে দেয়ার সুযোগটা হারিয়েছে সে, তবু তার হাবভাবের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব লক্ষ করল রানা। এলোপাতাড়ি গুলি না ছুঁড়ে যদি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করার জন্যে সময় নিত, তিনজনের একজনও এতক্ষণ বাঁচত না।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই .৩৮টা রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে। একবার মাত্র গড়াল ও, সিধে হলো এক হাঁটুর ওপর, অস্ত্রটা ধরে আছে লম্বা করা দু'হাতে।

রানার হাতে একবারই গর্জে উঠল অস্ত্রটা, হাঁটু দুটো ভাঁজ না করেই বসে পড়ল আবুল খায়ের। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, আবার গুলি করার জন্যে তৈরি। একটা কনুইয়ের ওপর কাত হলো আবুল খায়ের, মাথা ঝাঁকাল, ঢলে পড়ে গেল মাটিতে পিঠ দিয়ে।

সমস্ত কিছু এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটেছে। নারীকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল, মহিলার ভাঁজ করা আঙুলগুলো দেবে বসেছে মুখের নরম মাংসে। অ্যাক্রোপলিসের বিশাল খোলা প্রাঙ্গণে নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হলো, চারদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন।

আবুল খায়েরের আধবোজা চোখের দিকে ঝুঁকল রানা। খুব বেশি সময় নেই তার। যে-কোন মুহূর্তে পুলিসও পৌঁছে যাবে। 'কে তোমাকে টাকা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্ষীণ হাসি ফুটল আবুল খায়েরের ঠোঁটে, যেন বলতে চাইল উত্তর পাবার আশা করে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে রানা।

‘কেসটা অন্যভাবে সাজানো হতে পারে,’ বলল রানা, ‘শেষ মুহূর্তে তুমি যদি সহযোগিতা করো। নিজের আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করো। দেশের কথা ভাবো। সবাই জানবে তুমি বেঈমানী করেছ। আর যদি স্বীকার করো…’

আধবোজা চোখ পুরোপুরি খুলে গেল, অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল আবুল খায়ের। ‘আপনি কথা দিচ্ছেন?’

‘দিচ্ছি,’ বলল রানা। ‘অন্তত তোমার দলবদলের কথা প্রচার করা হবে না। কাদের কাছ থেকে টাকা খেয়েছ তুমি?’

‘কর্নেল রুস্তমভ… ’

আবুল খায়েরের মাথাটা দু’হাতে ধরে খানিকটা উঁচু করল রানা। ‘তারা জানল কিভাবে?’

খক্ খক্ করে কাশল আবুল খায়ের। ‘আমার ছেলে আছে দেশে, সে যেন না জানে…আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি…না জানে…’

‘জানবে না। কর্নেল জানল কিভাবে?’

‘কর্নেলকে আমিই জানাই…’

‘তুমি জানলে কিভাবে?’

‘আমি আড়ি পেতে শুনে ফেলি, তারপর আমাকে বলে ও।’ একটা হাত তুলতে গিয়েও পারল না আবুল খায়ের।

‘তোমাকে বলে?’ স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

‘কাকে বলেনি তাই বলুন!’

চোখ বুজে এল আবুল খায়েরের, খোলা মুখ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল খানিকটা তাজা রক্ত। তার ঘাড়টা নেতিয়ে পড়ল। মারা গেছে।

মুখ তুলল রানা, চন্দনকে দেখতে পেল। এথেন্স কন্ট্রোল-এর

দুচোখ থেকে আগুন ঝরছে। ঝট করে ডাচ জর্জের দিকে ফিরল সে। 'ইউ বাস্টার্ড! শালা বেজন্মা বাচাল কোথাকার!'

'আমি শুধু দু'একজন বন্ধুকে বলেছি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকে মানুষ গোপন কথা বলে না?' ডাচ জর্জের ভঙ্গিটা আত্মরক্ষার, কিন্তু মাফ চাওয়ার মত নয়।

মারমুখো হয়ে তার দিকে এগোল চন্দন, তাকে ঠেকাল রানা। 'ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখো, আবুল যাকে গুলি করেছে।'

'আগেই দেখেছি, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'মারা গেছে।'

'দুটো লাশই মর্গে নিয়ে যাক পুলিস,' বলল রানা। 'দূতবাস পরে ক্লেইম করবে।' ডাচ জর্জের দিকে ফিরল ও। 'এসপিওনাজ জগতে চালাক হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তোমাকে চৌকশ হতে হবে। ঝুঁকিটা প্রাণ হারাবার। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল ডাচ জর্জ। বারকেইনহেইমার দ্রুতবেগে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন।

'তাহলে ছড়িয়ে পড়ো। পুলিস আসার আগেই কেটে পড়া দরকার।'

ট্যুরিস্টদের অনেকেই ইতিমধ্যে ভয় কাটিয়ে উঠেছে। পাঁচিলের কাছে পড়ে থাকা লাশটার দিকে দু'একজন করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। দেখাদেখি তাদের পিছু নিল আরও কিছু লোক। সবাই কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে ওদের তিনজনের কোন অসুবিধে হলো না। অন্ধকারে কে কোন্ দিকে গেল কেউ লক্ষ করল না।

তিন

ঢেউয়ের নিচে দম বন্ধ করল রানা। শরীর অবশ করে দেয়া আতংক ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মন থেকে। মিলির দীর্ঘ চুল নাগালের মধ্যে পেয়ে ধরে ফেলল, তারপর টান দিল নিজের দিকে।

ডুবে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে মিলি, নরম হয়ে গেছে পেশী, অকস্মাৎ ঝাঁকি লাগায় চৈতন্য ফিরে পেল সে, রানার কাজে সাহায্য করার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ল।

পানির ওপর মাথা তোলার চেষ্টা করছে রানা। কোথায় যেন শুনেছিল, কোন মানুষ পানিতে মরার আগে তিনবার ডোবে...আমি মাত্র একবার ডুবেছি, ভাবল ও।

শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চাইছে। বাতাসের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে ফুসফুস। হঠাৎ ওর একটা হাতে বাতাস লাগল, বাঁচার আশা আর উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল সেই সাথে। সমস্ত শক্তি এক করে পা ছুঁড়ল ও। চোখ মেলে দেখল ওর পাশে পানির ওপর মিলির মুখটাও ভেসে উঠেছে।

শব্দগুলো প্রথমে চিনতে পারল না রানা। কানে পানি ঢুকেছে

বলে সন্দেহ করল ও। কিন্তু ভোঁতা ভোঁ ভোঁ কোন আওয়াজ নয়, রীতিমত তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ও। অবিশ্বাস্য লাগল ব্যাপারটা। সাপের মত এঁকেবেঁকে কি যেন একটা ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল একটা রশি, শেষ মাথায় বাঁচার অবলম্বন একটা রিঙ। লাইনটা খপ করে ধরে ফেলল রানা, অপর হাতে জড়িয়ে ধরল মিলির কোমর। নিস্তেজ ভঙ্গিতে রানাকে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, তার নগ্ন স্তন সেঁটে গেল রানার পাঁজরে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ায় বুকটা উঁচু-নিচু হচ্ছে।

রিঙটা হাতে চলে আসায় এতক্ষণে চারদিকে তাকাবার অবকাশ পেল রানা। আনন্দের আতিশয্যে দুর্বল লাগল শরীরটা। সেই ঘরমুখো বোটগুলোর মাঝখানে রয়েছে ওরা, বোটে দাঁড়ানো জেলেরা সমস্বরে আশ্বাস আর উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে। লাইফ রিঙ ধরে টানছে এক দশাসই জেলে, লাল ও নীল রঙের ছোট একটা ট্রলারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

ভিলার নিচে, পাথুরে সৈকতে, যেখান থেকে ভেলা নিয়ে আজ সকালে রওনা হয়েছিল ওরা, ঠিক সেখানেই ওদেরকে নামিয়ে দিল জেলেরা। বালির ওপর রোদের তাপ যথেষ্ট হলেও, জেলেদের দেয়া উলের তৈরি কম্বল গায়ে ঠাণ্ডায় হি হি করছে মিলি। কম্বলটা দু'ভাঁজ করে, শালের মত কাঁধে জড়িয়েছে সে। জেলেদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা, প্রস্তাব দিল ঋণ পরিশোধ করার জন্যে ওকে একটা সুযোগ দেয়া হোক। গাড়িতে টাকা আছে ওর, যাবে আর নিয়ে আসবে। প্রকাণ্ডদেহী জেলে সর্দার দলের পক্ষ থেকে সবিনয় হাসির সাথে বলল, সাগরে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সময় তাদেরকে যে সাহায্য করা হয় তা যদি পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে তাহলে জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্য সারা জীবন ঋণী থেকে

যাবে।

বোটগুলো চলে যাবার পর বালির ওপর হাঁটু দিয়ে বসল মিলি, হলুদ কম্বলটা তাঁবুর মত ঘিরে রেখেছে তাকে, রানার দিকে মুখ তুলে বলল, 'কেমন যেন লাগছে আমার।'

'লোনা পানি পেটে গেলে ভাল লাগার কথা নয়,' বলল রানা।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

চোখ নামিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। ভিজে রশির মত চকচক করছে তার লম্বা কালো চুল। উজ্জ্বল রোদ লেগে পানির ধারা আর ফোঁটাগুলো নীল আর রূপালি দেখাচ্ছে। 'দু'জনকেই জেলেরা বাঁচিয়েছে,' বলল ও। 'কৃতিত্বটা ভাগ্যকে দাও। চলো, ওপরে উঠি।'

'একটু অপেক্ষা করো,' বলল মিলি। মুখ নামিয়ে বালির দিকে তাকাল সে, যেন হাঁটুর সামনে নিজের ছোট্ট ছায়াটা পরখ করছে।

কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল রানা, 'চলো।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল মিলি। 'মৃত্যুর এত কাছে আর কখনও আসিনি আমি।'

'ভুলে যাও, বিপদ কেটে গেছে।'

'বেঁচে আছি দেখে আনন্দে দিশেহারা লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরি, প্রতিটি সাধ আর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করি।' গা থেকে খসে পড়ল কম্বলটা, উন্মোচিত হলো সোনালিবরণ নারীদেহ।

'জেলেরা তোমাকে কতটা ব্র্যান্ডি খাইয়েছে বলো তো?' জানতে চাইল রানা।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল মিলি, তার কণ্ঠস্বর খসখসে, 'আমাকে ধরবে?'

‘কোস্টাস অ্যারোনাফিস বলে একজন আছে, তোমার বয়ফ্রেন্ড–ভুলে যেয়ো না।’

‘আমি কারও কেনা নই, আজও কেউ আমাকে জয় করতে পারেনি।’

‘শেষবার তাকে আমি অস্ত্র হাতে দেখেছি,’ চারদিকে তাকাল রানা, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

মিলির গলায় রাগ, পিছন থেকে ধিক্কার দিল সে, ‘কেমন পুরুষ তুমি?’

‘বেঁচে থাকতে চায় বলে সাবধানে পা ফেলে,’ হাঁটার গতি শ্লথ না করে বলল রানা। একটা অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ও, মাথার ভেতর গিজগিজ করছে অসংখ্য সমস্যা, ঈর্ষাকাতর একজন প্রেমিককে খেপিয়ে তুলে পরিস্থিতিটাকে আরও প্রতিকূল করার কোন ইচ্ছে ওর নেই। কাল রাতে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, আজ সকালে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে একটা জাহাজ। দিনের বাকি সময়টা ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছে মনটা।

ব্লাফ-এর মাথায় ওঠার আগেই ধোঁয়ার গন্ধটা নাকে ঢুকল। দুপ দাপ করে রাগী পা ফেলে উঠে এসেছে মিলিও, নগ্ন বুক সম্পর্কে যেন সচেতন নয়। হাসি চেপে রানা ভাবল, কোটিপতি অ্যারোনাফিসকে হতভম্ব করতে না পারলেও, তার বাটলারকে ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দিয়ে মজা পাবে মিলি। অদ্ভুত ছেলেমানুষি একটা ভাব রয়েছে তার সমস্ত আচরণে। নিজেকে জাহির করতে ভালবাসে।

হাত ইশারায় মিলিকে পিছনে অপেক্ষা করতে বলল রানা। তারপর সাবধানে কিনারা টপকে ব্লাফ-এর মাথায় উঠল।

গন্ধটা এখানে আরও জোরাল, অথচ এখনও আগুনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। নিচ থেকে ঢেউগুলোর বিরতিহীন আছাড় খাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। রানার সামনে জলপাই গাছগুলোর ভেতর দিয়ে সশব্দে বইছে বাতাস।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মিলি, দুপ দাপ শব্দ তুলে রানার পাশে উঠে এল। 'গন্ধটা কিসের?' জানতে চাইল সে।

'আমার কাছাকাছি থাকো,' বলল রানা, গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল।

সেই গলিটায় চলে এল ওরা, কোস্টাল হাইওয়ে থেকে ভিলার দিকে চলে গেছে। গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা।

সকালে এখানেই বাঁক নিয়েছিল কালো মার্সিডিজটা। এখন সেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খালি একটা গাড়ি-পথ কিছুই প্রমাণ করে না, মনটা আরও যেন খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। গলি ছেড়ে আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকল ও। ওর ভাড়া করা সিমকাটা এখান থেকে সামান্য দূরে।

দেখে মনে হলো গাড়িটায় কেউ হাত দেয়নি। দরজার তালা খুলে .৩৮টা বের করল রানা।

'ওটা কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মিলি।

'বলা তো যায় না, যদি লাগে।'

'আমি জানতাম না তোমার কাছে অস্ত্র আছে।'

'আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না তুমি।'

'তোমার এখন বরং চলে যাওয়াই ভাল,' বলল মিলি। 'আবার আমরা দেখা করতে পারি। আমি কোথায় গান করি তুমি জানো।' ঘুরল সে, গলির দিকে হাঁটা ধরল।

হাত লম্বা করে তার কব্জিটা ধরে ফেলল রানা। ব্যথায় উফ্ করে উঠল মিলি। 'দাঁড়াও!'

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল মিলি। 'ছাড়ো! আমি সময় নষ্ট করতে রাজি নই। তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না...'

'এক মিনিটের জন্যে সেক্সের কথা ভুলে থাকবে, প্লিজ?'

'আমাকে তুমি অপমান করেছ...দু'বার!' জেদের সুরে বলল মিলি। 'তাছাড়া, এই অবস্থায়...তুমি বেদিং সুট পরে আছ, আর আমি এভাবে...আমার সহ্য হচ্ছে না।' নিজের দিকে তাকাল সে, তারপর মাথাটা সবেগে পিছন দিকে কাত করে কাতর কণ্ঠে বলল, 'আমি সৌন্দর্যের পূজারিণী, ভোগে বিশ্বাস করি। জানি না নিজেকে কিভাবে এতদিন সামলে রেখেছিলাম। তোমাকে দেখে আমার সমস্ত ধৈর্য আর সংযম চুরমার হয়ে যাচ্ছে।'

'চলো ভিলায় যাই। সব সময় গাছের আড়ালে থাকবে।'

'আড়াল জিনিসটা দরকার হয় গোপন কাজ করার জন্যে,' রানার সাথে হাঁটা ধরে বলল মিলি, গোলাপ পাপড়ির মত কোমল ছোট্ট সুন্দর মুখটায় কৃত্রিম অসন্তোষ।

রানা কোন জবাব দিল না।

খানিকটা হাঁটার পর আবার বলল মিলি, 'কোস্টাসকে তোমার আসলে ভয় পাবার কোন দরকার নেই, বুঝলে!'

এবারও কোন জবাব দিল না রানা। সাবধানে হাঁটছে, পিস্তল ধরা হাতটা কোমরের কাছে তোলা।

'সে এমনকি নেইও এখানে,' বলল মিলি।

'কি?' মিলির দিকে ঘুরল রানা। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

মসৃণ একটা কাঁধ ভারি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ঝাঁকাল মিলি। 'আমাদের চাপা দেয়ার চেষ্টা করল ইয়টটা। কার ওটা?'

‘কার?’

‘কোস্টাসের, আবার কার!’

‘বলো কি! আমাকে আগে বলোনি কেন?’

‘বলিনি…বলিনি ভয়ে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, জানতে পারলে এ-ধরনের কিছু একটা করবে তুমি, এখন যা করছ।’

নির্জন জঙ্গলের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

‘কোস্টাসকে তোমার ক্ষমা করতে হবে,’ আবার বলল মিলি। ‘তাকে বুঝতে পারলে তুমি তাকে ক্ষমা করবেও।’

‘কি রকম?’ বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পারলেও কৌতুক বোধ করল রানা।

‘কাজটা করেছে স্রেফ ভালবাসার খাতিরে, ঈর্ষাবশত। কোস্টাস আমাকে দেখাতে চায়, আমার প্রতি কত গভীর তার টান। কিন্তু কাজটা করার পর এখন তার অবস্থা কি হবে জানো? অনুতাপে দগ্ধ হবে বেচারি, একা একা নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে। তারপর, আবার যখন দেখা হবে আমাদের, ভাবতে পারো তখনকার পরিস্থিতিটা? আনন্দে, উল্লাসে…মানে আমাদের রিইউনিয়নটাকে বলা যেতে পারে…’

‘দুটো গ্রহের মুখোমুখি সংঘর্ষ?’

‘ঠিক তাই!’ চিৎকার করে বলল মিলি। নিজের দু’কোমরে হাত রাখল সে। ‘এ-সব শুনে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না?’

‘আমি শুধু বুঝতে পারছি, মগজ বিতরণের সময় লাইনে সবার শেষে ছিলে তুমি, তবে অন্যান্য দান গ্রহণ করার সময় লাইনে ছিলে সবার আগে।’ লোভী নয়, প্রশংসার চোখে মিলির শরীরে তাকাল রানা।

‘ওহ্!’ মিলির দীঘল কালো চোখ থেকে আগুন ঝরল। ‘আমি

গ্রীক! তোমার বোঝার কথা নয়। আমার সমস্ত কিছু গ্রীক।’

‘হ্যাঁ, সাংঘাতিক দুর্বোধ্য।’

‘তোমার মত শীতল একজন মানুষ বুঝতে পারবে, এ আমার আশা করা উচিত হয়নি।’

ঘুরে দাঁড়াল রানা। ওর পিছনে শুকনো ঘাস আর পাতা খস খস করে উঠল, পিছু নিয়েছে মিলি। মনে মনে একটা আশংকা করছে রানা। ভিলার ভেতর না জানি কি দেখতে পাবে। ওর উদ্বেগের ভাগ মেয়েটাকে দেয়ার কোন ইচ্ছে না থাকলেও, সতর্ক হবার সময় পেল না ও, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতেই ভিলার নিচের দিকটা এতক্ষণে পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হলো। ওর আশংকা মিথ্যে নয়।

মিলির দম বন্ধ করার আওয়াজ পেল ও। ‘গড, ওহ্ গড!’ আঁতকে উঠল মেয়েটা। ‘ভিলায় আগুন ধরে গেছে!’

‘সাবধান,’ বলল রানা, চারদিকে চোখ রেখে সামনের খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এল।

‘কেউ বোধহয়…তাই না…?’

‘আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ।’ চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। ‘তারা হয়তো এখনও এখানে আছে।’

‘তারা মানে? কাদের কথা বলছ তুমি?’

‘চিনি না।’

ভিলার কাঠামোটা অসংলগ্ন, ছোটখাট একটা পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে। ওরা দেখল, লাল টালির ছাদের নিচ থেকে ধূসর-হলুদ ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, অন্তত দু’জায়গায়। বাতাস থাকায় ধোঁয়াটা জমতে পারছে না ভিলার মাথায়। যে কারণেই আগুনটা লেগে থাকুক, চুনকাম করা কংক্রিটের পাঁচিল, মার্বেল

দেয়াল ও টেরা কোটা মূর্তিগুলোর কোন ক্ষতি না করেই নিভে গেছে বা যাচ্ছে।

একটা বাঁক ঘুরল রানা, প্রবেশপথের দিকে এগোল। চারদিকের জমাট নিস্তব্ধতা ভৌতিক লাগল ওর। কমলা গাছগুলোর প্রতিটি শাখা খালি, একটা পাখি নেই। রানা লক্ষ করল, খোলা চাতালে একটা রূপালি রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটার চাকা বসে গেছে, ভেতরে বাতাস নেই। তারপর দেখতে পেল কড়া ভাঁজের সাদা মেস জ্যাকেট পরা একজন চাকরকে।

টালি দিয়ে ছাওয়া প্রবেশপথে পড়ে আছে লোকটা। নড়ছে না।

'সিকো!' ডাকল মিলি। রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল সে। লোকটার ওপর ঝুঁকল।

রানা পৌঁছুল অভ্যস্ত সতর্কতার সাথে, মাথাটা ডানে বাঁয়ে ঘুরছে। পুরু রক্তের স্তরে শুয়ে রয়েছে সিকো। রক্তের কিনারায় ভন ভন করছে মাছির ঝাঁক। গাঢ় পায়ের ছাপ দেখা গেল, জুতোয় রক্ত নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে কেউ। চারদিকে তাকিয়ে সিকোর ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল রানা। 'মারা গেছে,' বলল ও।

'দেখতেই তো পাচ্ছি। ওর অস্ত্রটা দাও আমাকে।'

'গুলি করতে জানো?' সিকোর পাশে পড়ে থাকা নাইন এমএম বেরেটা অটোমেটিকটা তুলল রানা। 'শুধু আত্মরক্ষার জন্যে,' মিলি মাথা ঝাঁকাতে বলল ও। 'কোন রকম পাগলামি দেখতে চাই না।'

'আত্মরক্ষা করতে বলো...,' গলা বুজে এল মিলির, নাক টানল সে, সামলে নিল নিজেকে, '...সিকোর খুনিদের।'

ইয়টটার কথা মনে পড়ল রানার, ওদেরকে প্রায় খুন করে

ফেলেছিল। ‘এমন হতে পারে, কোস্টাস অ্যারোনাফিস হয়তো প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল। সে হয়তো আমাদের দেখতেই পায়নি।’

সিকোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মিলি। ‘জানো, বাগানের সবচেয়ে বড় গোলাপগুলো আমার জন্যে আলাদা করে রাখত ও।’

লাশ ছেড়ে উঠল রানা, খোলা দরজাটার দিকে তাকাল। আকারে বিশাল, সাইপ্রাস কাঠ দিয়ে তৈরি, গায়ে পিতলের পাত চকচক করছে। সতর্কতার সাথে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল ও। কিছুই নড়ছে না। কোন শব্দও নেই। অপেক্ষা করছে রানা। পিছনে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা সোনালি গিরগিটি। পাম গাছের পাতা খসখস করে উঠল বাতাসে।

বড় করে শ্বাস টেনে ভেতরে ঢুকল রানা।

কিছু কিছু ক্ষতির চিহ্ন দেখা গেল, তবে ব্যাপক নয়। মিশরীয় সারকোফ্যাগাস-এর বিশাল একটা মাথা দুর্লভ অস্ট্রেলিয়ান বটলট্রির পাশ থেকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা একটা প্রাচীন পাথুরে শবাধার, ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ, গায়ে প্রাচীন লিপি খোদাই করা রয়েছে। আয়না লাগানো একটা দেয়ালে নিজের চেহারা দেখতে পেল রানা, দেয়ালটার সাথে একটা ফায়ারপ্লেস রয়েছে। ওর ডান দিকে পদ্মপাতার ওপর বসে রয়েছেন বুদ্ধদেব, ফুলের পাপড়িগুলো সোনার তৈরি।

নরম কার্পেটে পা ফেলে এগোবার সময় ক্ষীণ ধোঁয়া লাগল রানার চোখে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ডিসপ্লে কাউন্টারকে পাশ কাটাল ও, গাঢ় রঙের রোডস প্লেট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাহাজ, মাছ আর ফুলের আকৃতি। ছাদের দু'একটা কড়িকাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, তবে একটাও ভেঙে নিচে পড়েনি। দুটো টালি

খসে পড়েছে মেঝেতে, ফাঁকগুলোয় রোদ আর ধোঁয়াটে ভাব দেখা গেল। একটা হলওয়েতে বেরিয়ে এল রানা।

দ্বিতীয় লাশটা পাওয়া গেল অগ্নিদগ্ধ বেডরুমে।

গ্যাসোলিনের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। মেঝের দিকে তাকাতেই ভাঙা মদের বোতলটা দেখতে পেল ও, মুখের কাছে জড়ানো রয়েছে ছেঁড়া ও পোড়া এক ফালি কম্বল।

মলোটভ ককটেল।

একটা জানালার সমস্ত ভাঙা কাঁচ কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মলোটভ ককটেল বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে কামরার ভেতর আগুন ধরে যায়। চারদিকের দেয়ালে কাপড়ের পর্দা ছিল, চোখের পলকে তন্দুরে পরিণত হয় কামরাটা। আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে শুধু খাটের স্টীল ফ্রেম আর স্প্রিংগুলো।

নিচের দিকে ঝুলে পড়া স্প্রিঙের ওপর পড়ে আছে হতভাগ্য লোকটা, সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। শুধু যে মুখটা পুড়েছে তাই নয়, হাত দুটোও রক্ষা পায়নি। সনাক্ত করতে হলে ডেন্টাল রেকর্ডের সাহায্য নিতে হবে, ভাবল রানা। থমথমে চেহারা নিয়ে পিছু হটল ও।

পিছন থেকে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পেল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে মিলির কাঁধ ধরল ও, মেয়েটাকে নিয়ে ফিরে এল হলওয়েতে। 'তাকিয়ো না,' বলল ও।

'ও নিশ্চয়ই কোস্টাস,' নিঃশ্বাসের সাথে ফিসফিস করল মিলি।

চিৎকার আর কান্না আশা করেছিল রানা, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। স্বস্তির একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাড়িতে ক'জন লোক ছিল বলতে পারবে?' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, হলওয়ের শেষ মাথার দিকে।

‘শুধু কোস্টাস আর সিকো। সিকো তার ম্যানসার্ভেন্ট। কিন্তু কেন?’ রানাকে ধরে দুর্বল হাতে ঝাঁকাল মিলি। ‘এভাবে কেন কেউ...?’

‘তারা হয়তো আমাকে মারতে চেয়েছিল,’ বলল রানা।

‘কি! তোমাকে?’

‘হয়তো ভেবেছিল, এখানে আছি আমি।’

এক সেকেন্ড চিন্তা করল মিলি, রানাকে এখনও ধরে আছে সে। ‘তাহলে তারাই ইয়টে ছিল!’ হঠাৎ বুঝতে পারায় চোখ দুটো সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। ‘কিন্তু...কেউ কি তোমাকে খুন করতে চায়?’

‘বহু লোক।’

শিউরে উঠে রানার গায়ে হেলান দিল মিলি। কি যেন বলতে চাইল সে, কিন্তু তার আগেই আরেকজন কথা বলে উঠল, ‘দেখে মনে হতে পারে, খুন-খারাবি আর ফুর্তি, দুটোই তুমি সমানে চালাতে পারো।’

রানা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই, ওর পাশ থেকে গর্জে উঠল মিলির বেরেটা।

চার

‘না!’ চিৎকার করল লোকটা।

মিলি দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই হাত ঝাপটা দিয়ে অস্ত্রটা একপাশে সরিয়ে দিল রানা। ঘুরল ও, দেখল হলওয়ের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাচ জর্জ, তার পাশের দেয়ালে বুলেটের একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। অকস্মাৎ গুলি হওয়ায় ভয় পেয়েছে সে, তা সত্ত্বেও তার সরু চেহারায় বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকু ম্লান হয়নি, উঁচু হয়ে রয়েছে একটা ভুরু।

'মিলিকে তুমি নার্ভাস করে দিয়েছ,' বলল রানা। 'উঁকি-ঝুঁকি মারা আমিও পছন্দ করি না।' কাল রাতে অ্যাক্রোপলিসে যা ঘটেছে তারপর আর ডাচ জর্জকে বিশ্বাস করে না ও—বাচালতা যদি তার একমাত্র দোষ হয়, সেটাই যথেষ্ট।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে হাসি পেলেও হাসল না রানা। ডাচ জর্জের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবার সাথে সাথে রানার পিছনে লুকিয়ে লজ্জা ঢাকল মিলি। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ডাচ জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারিনি তুমি...'

'বিশ্বাস করলাম, বুঝতে পারোনি,' বলল ডাচ জর্জ, সরু গোঁফের প্রান্ত ধরে মোচড় দিল সে। 'তোমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার সময় ভাবিনি যে তোমাকে নিয়ে এভাবে মেতে উঠবে রানা।'

শক্ত হয়ে উঠল রানার চোয়াল। 'বাজে কথা বলবে না!'

'তোমার পিছনে লুকোবার আগে ওকে আমি দেখেছি,' বলল ডাচ জর্জ। 'কি ভাবা উচিত আমার, তুমিই বলো?' সিল্কের রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। সিলভার-গ্রে রঙের সুট পরে আছে, পিতলের মাথাওয়ালা একটা ওয়াকিং স্টিক হাতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার, 'না, ভাই, স্বীকার করতে হবে, তোমার বুকে সাহস আছে। বলে কি!—কোস্টাস অ্যারোনাফিসের কাছ থেকে

তার গার্লফ্রেন্ডকে কেড়ে নিল!’

‘আসলে কি ঘটেছে, তোমার কোন ধারণা নেই,’ রানার পিছন থেকে বলল মিলি।

‘কি ঘটেছে?’ জিজ্ঞেস করল জর্জ।

‘সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই,’ বলল রানা। ‘কোস্টাস অ্যারোনাফিস সম্ভবত মারা গেছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে বিপদ হবে।’

‘মারা গেছে? তা কি করে হয়! দরজায় বেচারা চাকরটাকে দেখলাম বটে, কিন্তু...কোথায় সে?’

ইঙ্গিতে পিছন দিকটা দেখাল রানা। ‘বেডরূমের লাশটা তার হতে পারে।’

‘তারই,’ বলল মিলি। ‘বেডরূমে কোস্টাস ছাড়া আর কে থাকবে?’

এগিয়ে এল ডাচ জর্জ, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বেডরূমের দিকে এগোল। রানার পিছন থেকে সামনে চলে এল মিলি।

দরজার কাছ থেকে পিছু হটল ডাচ জর্জ। ‘কি বীভৎস!’ নাকে রুমাল চাপা দিল সে। ‘কিভাবে...কি ঘটেছে?’

‘বলতে পারব না। আমরা শুধু লাশ দুটো পেয়েছি।’ মিলির দিকে তাকাল রানা। ‘এখানে তোমার কাপড়চোপড় আছে?’

‘আছে।’

জর্জ বলল, ‘এথেন্স থেকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে তোমার লোক, চন্দন সরকার। তোমাকে জানাতে বলেছে, নেমিসিসের খোঁজ পাওয়া গেছে।’

‘গুড,’ বলল রানা। ‘কোথায়?’

‘পোর্ট সাঈদে। সুয়েজ ক্যানেল পেরোবার জন্যে লাইন

দিয়েছে জাহাজটা, তিন নম্বরে আছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবে কনভয়।'

'জাহাজে মি. নিকোলাই প্যাসিমভ আছেন কিনা জানা গেছে?'

মাথা নাড়াল জর্জ। 'শুধু হদিস পাওয়া গেছে জাহাজটার। আর কিছু জানা যায়নি।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'যেভাবে হোক জাহাজটায় চড়তে হবে আমাকে।'

'কিন্তু আমি ভাবছি সময়মত তুমি পোর্ট সাঈদে পৌঁছুতে পারবে কি?'

'না, তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। 'আরেক জায়গার কথা ভাবছি আমি। সরাসরি ক্যানেলে চলে যেতে পারি। রোজ দুটো করে কনভয় আসে, দুদিক থেকেই। পরস্পরকে পাশ কাটায় আল-বালাহ আর কিবরিত-এ, একটা নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে, অপরটা এগোয়। চেষ্টা করলে আল-বালাহ থেকে নেমিসিসে উঠতে পারব আমি। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে প্লেন দরকার।' জর্জের দিকে মুখ তুলল ও। 'একটা প্লেন চার্টার করা যায়?'

'রোডস আইল্যান্ডে হরতাল চলছে, জানো না? আজ সারাদিন কোন প্লেন টেক-অফ করেনি।'

'প্রাইভেট কোন প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'তোমাকে গুরুর পদে বসানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি,' সহাস্যে বলল জর্জ। 'শুধু হুকুম করেই দেখো না!'

'পাইলট না হলেও চলবে,' বলল রানা। 'শুধু প্লেনটা দরকার।'

'পাইলট না হলে চলবে মানে?'

'আমিই চালিয়ে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু রোডস আইল্যান্ড থেকে টেক-অফ করার অনুমতি পাবে কোত্থেকে? স্থানীয় লাইসেন্স না থাকলে ওরা তোমাকে ককপিটে বসতে দেবে না।'

'তাহলে পাইলটও দরকার হবে আমাদের।'

'সবই পাবে,' জানাল জর্জ। 'তবে একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'আমাকেও সাথে নিতে হবে,' বলল জর্জ।

হাসি চেপে রেখে রানা বলল, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়, বিশেষ করে ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে আমার যখন একজন লোক দরকার, কিন্তু তুমি তো আবার বেফাঁস কথা না বলে থাকতে পারো না।'

চোখ মিটমিট করল ডাচ জর্জ, যদিও চেহারায় হাসি-খুশি ভাবটা ধরে রাখতে পারল। 'শুনতে কর্কশ লাগলেও, এটা আমার পাওনা ছিল। কথা দিচ্ছি, আর কোন ভুল হবে না। আরেকটা কথা, এটা ঠিক অনুরোধ নয়, বলতে পারো দাবি। যেখানেই সম্ভব, এইচআরসি-র অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।'

'এখানে সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে প্লেনও নেই, পাইলটও নেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। এই মুহূর্তে এইচআরসি-র সাহায্য ছাড়া ওর চলবে না। 'আমার ধারণা হয়েছে, তুমি নির্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় লোক,' বলল ও। 'যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছ। আমার সাথে থাকলে বিপদে পড়তে পারো।'

'আমি অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে,' বলল ডাচ জর্জ। 'প্রিয় যে-কোন জিনিসের জন্যে যুদ্ধ করতে রাজি আছি আমি। আমার বিশ্বাস, প্রিয় জিনিস বাছাই করার অধিকার সব মানুষেরই আছে।'

অন্তত, ভাবল রানা, লোকটার একটা নীতি আছে। 'গুলি

চালাতে জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'লক্ষ্য ভেদ করতে পারি অব্যর্থভাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু মনে রেখো, নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছ তুমি।'

'ভেরি গুড,' তাড়াতাড়ি বলল জর্জ। 'মিলি আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কি বলো, মিলি?'

মিলির লালচে আকর্ষণীয় মুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'এই অদ্ভুত লোকটা কি রাজি হবে?' রানার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল সে। 'মেয়েমানুষ তো ওর জন্যে অ্যালার্জির কারণ।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর দিকে ফিরে জর্জ বলল, 'ওর লাইসেন্স আছে। কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে নিয়ে বহুবার চষে বেড়িয়েছে গোটা আকাশ। দু'একবার আমিও ছিলাম প্লেনে, সত্যি ভাল চালায়।'

'তুমি জানো না মেয়েটাকে কিসের সাথে জড়াচ্ছ,' বলল রানা।

মুখের হাসি নিভে গেল মিলির, থমথমে গলায় বলল সে, 'আমি শুধু জানতে চাই, কোস্টাসকে যারা খুন করেছে তোমরা তাদের কাছে যাচ্ছ কিনা?'

'হতে পারে,' বলল রানা।

'তাদের আমি দেখে নেব।'

'ওখানে খুনোখুনি কাণ্ড হবে,' বলল রানা। 'তুমি মারা যেতে পারো।'

গ্রীক ভাষায় জবাব দিল মিলি, 'তাতে কিছু আসে যায় না। গ্রীকরা প্রতিশোধ নিতে জানে।'

ডাচ জর্জের একঘেয়ে, নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর বদলে গেল, চাপা

উত্তেজনার সাথে বলল সে, 'কোস্টাস অ্যারোনাফিসের লিয়ারজেটটা নেব আমরা। ওটা আর তার দরকার নেই।'

ঘাড় ফিরিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। হাত দুটো আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকে তুলে রেখেছে সে। কৌতুক আর আবেদন ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এরপর ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা। সে-ও বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সিদ্ধান্ত নিল, যাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না তাদেরকে নিজের সাথে রাখাটাই বরং নিরাপদ, চোখ রাখার সুযোগ থাকে। বলা যায় না, ওরা হয়তো ওর উপকারেও লাগতে পারে। তাছাড়া, ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে সময়মত নেমিসিসে পৌঁছুনো যাবে না।

শান্তস্বরে বলল ও, 'ঠিক আছে। ক্যানেল পেরুতে একটা কনভয় সময় নেয় পনেরো ঘণ্টা। শিডিউল দরকার হবে, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। আজ রাতেই জাহাজে ওঠার চেষ্টা করব আমরা।'

মিলিকে কাপড় পরতে বলল রানা, তারপর জর্জকে নিয়ে চলে এল সিমকার কাছে। বেদিং সুটের ওপর নীল একটা সুট পরল ও। 'আজ রাতের জন্যে একটা ইনফ্লেটেবল র‍্যাফট দরকার হবে,' জর্জকে বলল। 'শহরে গিয়ে কিনে ফেলো। বৈঠার কথা ভুলো না। এই নাও।' জ্যাকেটের পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে জর্জকে দিল ও। 'ভেলাটা নিয়ে সোজা প্লেনে চলে যাবে। ক্যানাল শিপিং শিডিউল না পাওয়া পর্যন্ত কখন টেক-অফ করব বলতে পারছি না। ওটা পেলে, তোমার হোটেল স্যুইটে একটা মেসেজ পৌঁছে দেব। এখনও ইন্টারকনেই আছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ, টাকাগুলো পকেটে ভরল।

'আরেকটা কথা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। প্লেনে ওঠার আগে তোমাকে যেন না দেখি।'

'আর কিছু?'

'অস্ত্র নিতে ভুলো না।'

ভিলার দিকে ফিরছে রানা, শুনতে পেল জর্জের গাড়ি স্টার্ট নিল। ভিলায় ফিরে এসে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, সবগুলো ফোন বিকল হয়ে আছে। আগুনে পুড়ে যেতে পারে লাইন। তবে সম্ভবত কেটে দেয়া হয়েছে।

স্নায়ুর ওপর একটা চাপ অনুভব করল রানা। ভিলায় ওরা অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে।

ভেতর থেকে ভিলার সামনে বেরিয়ে এল ও। লাশটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বেরেটা ফেরত দিয়েছে মিলি, রুমাল দিয়ে হাতের ছাপ মুখে লাশের পাশে রাখল সেটা। ঝোপের মাঝখানে সরু গলিটার দিকে তাকাল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাগান, সুইমিংপুল, তারপর নীল সাগরের দিকে। ইয়টটার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, দেখা যাবে বলে আশাও করেনি ও।

আঁটসাঁট স্ল্যাকস আর গাঢ় রঙে ছাপা সিল্ক ব্লাউজ পরে বেরিয়ে এল মিলি, ব্লাউজটা বুকের নিচে শেষ হয়েছে, উন্মুক্ত হয়ে আছে নাভিসহ সবটুকু পেট। চুল শুকিয়েছে সে, এলো করে ছেড়ে দিয়েছে পিঠের ওপর, মখমলের মত চকচক করছে। 'আমি তৈরি,' বলল সে, তার চোখ দুটো লাশটাকে এড়িয়ে গেল।

'কোথায় বাঁধা ছিল ইয়টটা?' জানতে চাইল রানা। 'সকালে যখন এলাম, তখন তো দেখিনি।'

রানার হাত ধরল মিলি। 'এসো আমার সাথে,' বলে একটা

পথ ধরে এগোল সে। ভিলাটা ঘুরে ব্লাফ-এর শেষ মাথায় চলে এল ওরা। নিচে শান্ত একটা লেগুন দেখা গেল। প্রকৃতির তৈরি একটা বাঁধ হ্রদটাকে সাগর থেকে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে, শুধু মাঝখানে সামান্য ফাঁক দেখা গেল। নিচের সবুজ ঝোপ আর গাছপালা থেকে পাহাড়টা উঠে এসেছে একেবারে খাড়াভাবে, মাথায় ভিলাটা রত্নখচিত মুকুটের মত। 'গোপন হ্রদ, কি বলো?'

'এই একটা জায়গা বাদে অন্য কোথাও থেকে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব,' বলল মিলি।

'চলো, কেটে পড়ি। রোডস টাউনে পৌঁছে পুলিসে খবর দেবে তুমি।'

মুখ শুকিয়ে গেল মিলির। 'কাকে?'

'পুলিসকে। ফোনগুলো একটাও কাজ করছে না।' মিলির চোখে উদ্বেগ লক্ষ করল রানা। 'আগে বা পরে আসবেই পুলিস। ওদেরকে খবর দিতে দেরি করেছ তুমি, ব্যাপারটা যেন সেরকম না দেখায়। তা দেখালে তোমাকে সন্দেহ করতে পারে ওরা।'

বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে সিমকার দিকে এগোল ওরা। উত্তপ্ত বিকেলে চারদিক থেকে পোকামাকড়ের ডাক ভেসে আসছে। একটা গাছের নিচে মাটি প্রায় ঢাকা পড়ে আছে খসে পড়া কমলায়।

'কি বলব ওদের আমি?' জানতে চাইল মিলি।

'সাঁতার কাটছিলে, ক্লিফ-এর নিচে। কিছু শোনোনি বা দেখোনি। ভিলায় ফিরে এসে প্রথম জানতে পারলে। ফোন কাজ করছে না দেখে হাইওয়েতে চলে আসো, তারপর লিফট নিয়ে শহরে।' মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'কি, পারবে ম্যানেজ করতে?'

‘না পারার কি আছে।’ নার্ভাস দেখাল মিলিকে।

‘কথার প্যাঁচে তোমাকে ওরা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে। যদিও, আসলে সত্যি কথাই বলছ তুমি, একটা পর্যায় পর্যন্ত। কথা পাল্টাবে না।’ সিমকার দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা। প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল মিলি। দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। ‘আমার বা জর্জের কথা মুখেও আনবে না, কেমন?’

পিছু হটে জলপাই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সবুজ সিমকা, গলি ধরে হাইওয়ের দিকে এগোল। হাইওয়েতে পৌঁছুনোর আগেই বুড়োটাকে দেখতে পেল ওরা। বুড়োর মাথায় বিশাল স্ট্র হ্যাট, পায়ে বুট জুতো। একটা গাধাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। গাধার পিঠে শুকনো ডালপালার মস্ত বোঝা।

‘ধুত্তোরি ছাই!’ হুইলের ওপর চাপড় মারল রানা। ‘জঙ্গল থেকে বেরোবার আর সময় পেল না লোকটা!’

‘ওকে আমি চিনি, ফলের বাগানে কাজ করে,’ লোকটাকে পাশ কাটাবার সময় বলল মিলি।

‘গাড়িটাকে যদি চিনে রাখে, তাহলেই…’

মিলি আশ্বাস দিয়ে বলল, ‘বুড়ো হয়তো ভিলার দিকে যাবে না।’

তবু রানার মনে হলো, ভাগ্য ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

দ্বীপের গ্রামগুলো ছোট ছোট, একটার পাশে আরেকটা, সাদা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মধ্য গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ দেয়াল থেকে ছিটকে এসে ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখ। কোস্টাল হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে ছোট্ট সিমকা। ওদের বাঁ দিকে উপত্যকাগুলো গিয়ে ঠেকেছে রোদে পোড়া পাহাড়শ্রেণীর গোড়ায়, পাহাড়ের ওই

সারিটাকেই রোডস আইল্যান্ডের মেরুদণ্ড বলা হয়। বয়স্কা এক মহিলাকে দেখল ওরা, মাথায় লাল রুমাল জড়িয়ে লালচে-বেগুনি ফুল দিয়ে সাজানো সাসটা গাছের নিচে বসে এক পাল ছাগলের ওপর নজর রাখছে।

হাত তুলে গাছটা দেখাল মিলি, বলল, 'তুমি জানো, প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত ওই গাছের পাতার গন্ধ অ্যান্টিঅ্যাফ্রোডিজিয়াক? মানে, কামোদ্দীপক-এর উল্টোটা?'

'তাহলে ব্যাক করা দরকার গাড়ি,' বলল রানা। 'চলো, গন্ধটা শুঁকিয়ে আনি তোমাকে।'

খসখসে গলায় চাপা হাসি, সীটের ওপর ছটফট করে উঠল মিলি। 'জীবন কি সুন্দর! আজ সকালের ওই ঘটনার পর, পৃথিবীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি!' জানালা দিয়ে পীচ-এর বাগান দেখছে সে। 'সূর্যের নিজস্ব ভূমি এটা, জানো। সত্যি তাই। সূর্য দেবতা হিলিয়স তাঁর কনে হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এটাকে।'

'তোমার বাড়ি বুঝি এখানেই?'

'না। করিন্থ। পেলোপনিস-এ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলি। 'তবে এখানে হলে ভাল হত।'

রোডস সম্পর্কে সব জানে মেয়েটা। তিন হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার যে-কোন শক্তির সমকক্ষ ছিল দ্বীপটা। লিনডিয়ানরা, সম্ভবত আজ যে জেলেরা ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল তারা, খ্রিস্টের জন্মের সাতশো বছর আগে কলোনি হিসেবে গড়ে তোলে নেপলসকে। রোডস টাউন বলে তখন কিছু ছিল না। লিনডোস আর পাশে দুটো ছোট শহর মিলে আলাদা একটা আকৃতি পায়, পঞ্চম শতাব্দীতে গড়ে ওঠে দ্বীপের

নতুন রাজধানী–প্রাচীন গ্রীসে ওটা ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিকল্পিত শহর। সে-যুগের সেরা শিল্প আর স্ট্যাচু স্থান পায় রাজধানীতে। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস, দুই পণ্ডিতই এখানে পড়াশোনা করেন। আইনেও অবদান রাখে দ্বীপটা, প্রগতিশীল বাণিজ্যিক আইন গোটা রোমান সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্যে গ্রহণ করেন অগাস্টাস সিজার।

হেডরেস্টে হেলান দিল মিলি। বাতাসে কি একটা বুনো ফুলের গন্ধ।

আসগোরু গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোল সিমকা, নীলচে সিল্কের মত আকাশের গায়ে একটা সুচ ঢুকে আছে বলে মনে হলো তুর্কী মসজিদের মিনারটাকে।

'আমি কোস্টাসের কথা ভুলতে পারছি না,' বলল মিলি।

'তাকে তুমি ভালবাসতে?'

মিলির কানে লম্বা দুলজোড়া দুলে উঠল। 'আমি...আমি জানি না। তবে, ও আমাকে ভালবাসে, এটা আমার জন্যে গ্রেট ফান ছিল।' এক মুহূর্ত পর বিষণ্ন সুরে বলল, 'ওখানে ও পড়ে রয়েছে, আর আমি তোমার সাথে চলে যাচ্ছি, অপরাধবোধে ভুগছি আমি।'

'আমাদের আর কিছুই করার ছিল না,' বলল রানা। 'মনে রেখো, লোকটা অ্যারোনাফিস না-ও হতে পারে।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর হও কিভাবে?' হঠাৎ রাগের সাথে রানার দিকে তাকাল মিলি। 'আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে তোমার খারাপ লাগছে না?'

'মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'লাশটা যে-কারও হতে পারে। অ্যারোনাফিসের ইয়টটা তো আর নিজে থেকে আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেনি।'

'তাহলে?'

রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। 'ভিলায় ফিরে আমরা নতুন কোন গাড়ি দেখিনি, ঠিক? কাজেই, আমরা যদি ধরে নিই অ্যারোনাফিসকে খুন করার পর খুনিরা ইয়ট নিয়ে পালিয়েছে, তাহলে তাদের গাড়িটা গেল কোথায়, যে-গাড়িতে করে ভিলায় পৌঁছুল তারা?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মিলি। 'কিছু লোক ইয়টে করে পালিয়েছে, কিছু লোক গাড়িতে করে?'

'হতে পারে।'

রোডস টাউনে পৌঁছে গেল সিমকা, বাঁক ঘুরে ভিরোনস স্ট্রীটে ঢুকল রানা। এই রাস্তাটাই মধ্যযুগীয় ইউরোপের সবচেয়ে দুর্গম দুর্গগুলোকে ঘিরে রেখেছে। বিশাল আকৃতির এই সব প্রাচীর আর পাথুরে প্যারাপেটগুলো তৈরি করেছিলেন জেরুজালেমের সেইন্ট জন-এর নাইটরা, ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন যাঁরা চোদ্দশো শতাব্দীতে।

রোডস টাউন আজ ট্যুরিস্টদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। শর্টস আর সানগ্লাস পরা যুবক-যুবতীদের সবখানে দেখা যাবে, বেশিরভাগ স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে এসেছে।

তিন মাইল জুড়ে ব্যাটলমেন্ট, তারই মধ্যে পড়েছে রানার হোটেল, পুরানো শহর, কোলাচিয়াম বা নাইটস কোয়ার্টার, আর তুর্কী ডিস্ট্রিক্ট। মিলির অ্যাপার্টমেন্ট নিয়া কোরা-য়, অর্থাৎ নতুন শহরে, প্রাচীরের বাইরে। সরকারী অফিস, ডিউটি-ফ্রি শপ, ইত্যাদি সব নতুন শহরেই দেখা যাবে। পাঁচতারা হোটেলগুলো দ্বীপের উত্তর প্রান্তে।

রোডস টাউনে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ফুল। ফুলের দোকান

তো আছেই, প্রতিটি রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালারা সার সার বসে দুনিয়ার ফুল বিক্রি করছে। ভেসপা, মোটরসাইকেল গিজ গিজ করছে রাস্তায়, রাস্তা পেরোনো মহা ঝামেলার ব্যাপার। ব্যাংক অভ গ্রীস বিল্ডিং-এর কাছে বাঁক নিয়ে ভিরোনস স্ট্রীট ত্যাগ করল রানা, ওর পিছনে ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে নাইটস ক্যাসল। মানড্রাকি হারবারে ঝলমলে সাদা একটা ক্রুজ লাইনার আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। ইয়ট আর বিভিন্ন আকৃতির বোটগুলো লম্বা পাথুরে জেটিতে নোঙর ফেলেছে, মধ্যযুগীয় উইন্ডমিলগুলো বাতাস পেয়ে ঘুরছে অনবরত।

ফুটপাতের উন্মুক্ত কাফেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল সিমকা। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে কফি, টম টম কোলা বা আলফা বিয়ারে চুমক দিচ্ছে ট্যুরিস্টরা।

বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এল সিমকা, মুরাদ রেইস-এর মসজিদটা দেখা গেল, মিনারটা সাদা। মসজিদের উল্টো দিকে মিলিকে নামিয়ে দিল রানা। মসজিদের সাথেই কবরস্থান, পাইন আর ইউক্যালিপটাস দিয়ে ঘেরা।

'পুলিসকে খবর দেয়ার পর আমার হোটেলে ফোন করবে তুমি,' মিলিকে বলল রানা। 'ব্যাপারটা কিভাবে নিল ওরা, আমার জানা দরকার।' হোটেলের স্যুইট নম্বর জানিয়ে দিল ও।

অল্প দূরে অ্যাপার্টমেন্ট, হেঁটেই রওনা হলো মিলি। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পাহাড়ী পথ ধরল রানা।

ওর হোটেলটা, কামাল ইন্টারন্যাশনাল, তুর্কী এলাকায়। পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে দালানটা। হোটেলের সামনে ছোট একটা চৌরাস্তা, মাঝখানে সুদৃশ্য একটা কৃত্রিম ঝর্না। ঝর্নার পাশে আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল একটা ট্যাক্সি।

চারদিকে ছোট ছোট দোকান, লোকজনের ভিড়, ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব। বর্শা ও তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করছে ট্যুরিস্টরা। ভেসপা আর সাইকেল গিজগিজ করছে চারদিকে।

হোটেলের সামনে থামার আগে পিছনটা ভাল করে দেখে নিল রানা। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে ওর চোখে ধরা পড়ত। এত থাকতে কামাল ইন্টারন্যাশনালে ওঠার কারণ হলো, শত্রুপক্ষের তালিকায় যারা আছে তারা জানে মাসুদ রানা সব সময় অভিজাত হোটেল ছাড়া ওঠে না।

গথিক খিলানের নিচ দিয়ে হোটেলে ঢুকল রানা, কালো আর সাদা মোজাইক পেরিয়ে লবিতে চলে এল। 'আমার এক বন্ধু রিজার্ভ করেছে স্যুইট,' ডেস্কে বলল ও। 'রেজিস্টারটা দেখতে পারি?'

'অবশ্যই, স্যার!'

খাতার নামগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বোলাল রানা, কোনটাই স্মৃতিকে নাড়া দিল না। সেটা বন্ধ করে এলিভেটরের দিকে এগোল ও। ভিলায় যারাই আগুন দিয়ে থাক, তারা সম্ভবত ওর খোঁজে ওখানে যায়নি। তবে রানা যদি ধরে নেয়, ওকেই খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে।

এলিভেটরে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার লবির দিকে তাকাল রানা। দেয়ালে মধ্যযুগীয় ঢঙে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে লণ্ঠনগুলো। দিনের এই সময়টায় লোকজন নেই বললেই চলে। দু'চারটে মুখ, সব ক'টাকে নিরীহ বলে মনে হলো।

কামরায় ঢোকার সময় অভ্যস্ত সাবধানতা অবলম্বন করল রানা। ফার্নিচারগুলো গাঢ় রঙের আর ভারি। কুশনগুলোর কাভার হলুদ আর নীল ডোরাকাটা। প্রতিটি কামরার দেয়াল আকাশ নীল।

জানালার কার্নিশে বাকবাকুম করছে একঝাঁক পায়রা। জানালা-পথে টালি লাগানো বাড়িঘর দেখা গেল। আরও দূরে সাগর।

শাওয়ার সেরে লাঞ্চের অর্ডার দিল রানা। সামুদ্রিক মাছ মালিট, ক্রীম মাখানো রোস্ট করা খাসীর রান আর তরমুজ।

চারটে বাজতে চলল। অস্বস্তিবোধ করছে রানা। মিলি ফোন করেনি কেন?

তাই বলে কাজ ফেলে বসে থাকা চলে না। সুটকেস থেকে দুটো প্লাস্টিক পিলবক্স বের করল ও, একটা লাল, অপরটা ফার্মেসী-হোয়াইট। বহুরঙা পিলগুলো বের করে বিছানার ওপর রাখল ও। সাদা বাক্সটার ভেতর নখ দিয়ে খোঁচা দিল, গোপন ঢাকনিটা সরে যেতেই বেরিয়ে পড়ল অসংখ্য ফুটোসহ একটা প্লেট। এরপর স্ক্রু আলগা করে, বাক্সের বাইরের দিকের অর্থাৎ নিচের ঢাকনিটা খুলে ফেলল, সুতোর সাহায্যে ভেতরে ঢোকাল একটা রাবার কলার, সবশেষে ফ্লেক্সিবল কলারটা নিখুঁতভাবে আটকে দিল ওর রূম টেলিফোনের মাউথপীসে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোটেকনোলজির অবদান, সিলিকন–চিপ দিয়ে তৈরি, ভয়েস স্ক্র্যাম্বলারটা এখন ব্যবহার করতে পারে রানা। লাল পিলবক্সেও একই কারিগরি ফলাল ও, আটকাল ইয়ারপীসে। সব মিলিয়ে এক মিনিটের মত লাগল।

বি.সি.আই. এথেন্স কন্ট্রোল থেকে অচেনা একটা কণ্ঠস্বর সাড়া দিল। নিজের পরিচয় দিয়ে স্ক্র্যাম্বলার ট্র্যান্সমিশনের জন্যে অনুরোধ করল রানা।

'ইউ হ্যাভ গট ইট, স্যার,' জবাব এল কন্ট্রোল থেকে।

সংযুক্ত মাউথ আর ইয়ারপীসের প্রেশার-সেনসিটিভ অংশ স্পর্শ করল রানা, প্লাস্টিক ভেদ করে বেরিয়ে এল লালচে অস্পষ্ট

আভা। ‘চন্দন সরকারের সাথে কথা বলব আমি,’ বলল ও।

‘এক মিনিট।’

হোল্ড বাটনে চাপ পড়তে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। রোদ যেন সাদা আগুনের মত ছড়িয়ে আছে শহরটার ওপর।

‘স্যার?’

‘শুনছি।’

‘চন্দন সরকার রোডসের পথে রয়েছেন।’

‘এখানে আসছে? আমাকে তো বলেনি!’

‘এইমাত্র রওনা হয়েছেন, স্যার।’

‘কেন?’

‘তা জানার অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি, স্যার।’

‘ঠিক আছে, দেখা হলে জেনে নেব আমি। আমার একটা কাজ করতে পারবে?’

‘বলুন, স্যার।’

‘সুয়েজ ক্যানেল কনভয় সম্পর্কে। দক্ষিণমুখী পরবর্তী কনভয়টা আল-বালাহ বাইপাসে কখন পৌঁছুবে?’

‘লাইনে থাকুন, আমি দেখছি।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে লেবু রঙা সিলিঙে তাকাল রানা। দূর থেকে মোয়াজ্জিনের গলা ভেসে আসছে, অল্প যে-ক’জন তুর্কী আছে তাদেরকে নামাজ পড়ার জন্যে ডাকছে। বেশিরভাগই তারা বারো মাইল দূরে স্বদেশে ফিরে গেছে, উনিশশো বারো সালে ইটালিয়ানরা দ্বীপটা দখল করে নেয়ার পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রোডস আবার গ্রীসের একটা অংশে পরিণত হয়।

এথেন্স কন্ট্রোল থেকে বলা হলো, ‘একটা কনভয় এইমাত্র

বাইপাসে পৌঁছুল।'

'প্রথমটা,' বলল রানা। 'আমি দ্বিতীয়টা সম্পর্কে আগ্রহী।'

'দ্বিতীয়টা পৌঁছুবে বারোশো ঘণ্টায়, পনেরো মিনিট আগে বা পরে।'

'ধন্যবাদ।'

'আর কিছু, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ।'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সময়ের একটা হিসেব করল রানা। এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে নয়শো মাইল পাড়ি দিয়ে পোর্ট সাঈদে পৌঁছুনো একটা লিয়ারজেটের জন্যে কোন সমস্যা নয়। রাতের অন্ধকারে রওনা হবে ওরা, তারপরও হাতে কিছু সময় থাকবে। তবে সময়টা এমনভাবে ভাগ করে নিতে চায় ও, ওরা যেন জাহাজটা নোঙর করার সময় পৌঁছোয়।

জাহাজে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে আসতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসতে হবে মিশর থেকে।

ধরতে পারলে আকাশ-সীমা লংঘনের অভিযোগ তুলে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রানার সামনে বিকল্প কোন পথও খোলা নেই। নিয়ম হলো, প্রাইভেট কোন প্লেন মিশরে ঢুকতে চাইলে চব্বিশ ঘণ্টা আগে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

মিগ বিমান আর স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের কথা মনে পড়লেও, গ্রাহ্য করল না রানা। সিভিলিয়ান প্লেন, সাবধান না করে গুলি করবে বলে মনে হয় না।

রাতটা টেনশন আর ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে, যে-টুকু সময় পাওয়া যায় ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। কাল রাতের বেশিরভাগ সময় ইন্টারকন হোটেলের ক্যাসিনোয় কাটিয়েছে ও,

ডাচ জর্জের জুয়াড়ী বন্ধু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে নিজেকে। অভিজ্ঞতা থাকায়, সামান্য কিছু জিতেছে ও।

ইন্টারকনে ফোন করে জর্জের নামে একটা মেসেজ দিল রানা। লোকটার সঙ্গ পছন্দ করে না ও, তবে জানে এইচআরসি-র সাথে কাজ করতে হলে কিছু কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। গোটা অ্যাসাইনমেন্টটা বি.সি.আই. তাদের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে, এটা ওদেরকে ভাবতে দেয়া চলবে না। তা না হলে একশো একটা রাজনৈতিক বিপদ দেখা দেবে।

নিচের রাস্তাটায় একবার চোখ বোলাল রানা। একটা পাহাড়ের ঢাল জুড়ে দোকান-পাট সাজানো হয়েছে, ট্যুরিস্ট ক্রেতাদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। তুর্কী বাড়িঘরগুলো চেনা যায় ইসলামী স্থাপত্যরীতির কল্যাণে, ঝুল-বারান্দাগুলো খালি। কালো আলখেল্লা পরা বৃদ্ধ এক পাদ্রী এক পা এক পা করে হেঁটে গেল হোটেলের সামনে দিয়ে।

কেউ যদি ওর ওপর নজর রেখেও থাকে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

জানালার পর্দা টেনে দিল ও, বালিশের তলায় অস্ত্র রেখে বিছানায় লম্বা হলো। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। চোখ খুলল না, হাতড়ে খুঁজে নিল ফোনের রিসিভারটা। 'হ্যালো।'

'আমি লাউঞ্জে...'

'চন্দন?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ক্রেডলে রিসিভার রেখে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল

রানা, তারপর চারদিকে তাকাল। ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করল, আলোটা চোখে সয়ে আসতে হাতঘড়ি দেখল। ন'টা বেজে চোদ্দ মিনিট। ভেবেছিল আরও আগে ঘুম ভাঙবে।

চন্দন এল কেন?

তারচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, মিলির কোন খবর নেই।

বিছানা ছেড়ে নামল রানা, জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পুব আকাশে ভোরের আভা ফুটতে শুরু করেছে। পাকা আঙুরের মত লাগল কাছাকাছি আকাশের তারাগুলোকে। রাস্তায় লোকজন নেই।

গায়ে জ্যাকেট চড়াচ্ছে রানা, ভাবছে মিলির কথা। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। ভাল কিছু না হবারই সম্ভাবনা। ধরা পড়েছে অপরাধীদের হাতে, ভিলায় যারা আগুন দিয়েছিল? সন্দেহবশত আটকে রেখেছে পুলিস?

নাকি কেটে পড়েছে মিলি, ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? চিন্তা করার সময় পেলে সব মানুষই প্রথমে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবে। স্থানীয় লাইসেন্স না থাকায় রোডস এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন নিয়ে উঠতে পারবে না রানা, অল্প সময়ের নোটিসে আরেকজন পাইলট খুঁজে পাওয়াও সম্ভব নয়। ওদিকে নেমিসিসও ওর জন্যে সুয়েজ ক্যানেলে অপেক্ষা করবে না।

কামরাটা ভাল করে দেখে নিল রানা, তারপর নিচে নামল।

লাউঞ্জে লোকজন নেই বললেই চলে। আলো খুব কম হলেও চন্দনকে চিনতে পারল রানা। এক কোণে একটা সোফার ওপর পিঠ খাড়া করে বসে আছে সে, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। চকচকে লালচে একটা টাই পরে আছে সে।

'আপনি জানেন, মাসুদ ভাই, নেমিসিসকে খুঁজে পেয়েছি আমরা?'

'মেসেজটা দিয়েছে জর্জ,' বলল রানা, চন্দনের সামনের সোফায় বসল, হাত নেড়ে বিদায় করল ওয়েটারকে।

'আপনি এখন কি ভাবছেন?' জানতে চাইল চন্দন।

'ক্যানেলে যাব, জাহাজটায় চড়তে হবে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি, মাসুদ ভাই। তবে ঝুঁকি আছে, আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

রানা কিছু বলল না। চন্দনকে নার্ভাস বলে মনে হলো ওর। কেন এসেছে, বলছে না কেন?

'আপনি কি, মাসুদ ভাই, এখুনি রওনা হবেন?'

'আমার পাইলট যদি হাজির হয়। মিলি পুলটিস। অ্যারোনাফিসের গার্লফ্রেন্ড।'

'মাই গড!'

'তোমার সমস্যাটা কি, চন্দন? নেমিসিস বা নিকোলাই প্যাসিমভ সম্পর্কে কথা বলার জন্যে আসোনি তুমি।'

'মেয়েটার সাথে পুলিস যেন আপনাকে দেখতে না পায়, মাসুদ ভাই,' বলল চন্দন। 'গ্রীক পুলিস দুই আর দুই পাঁচ বানাতে ওস্ত াদ।'

রেগে গেল রানা, 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল ও।

'অ্যারোনাফিস অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, মাসুদ ভাই। পুলিসের ধারণা, আপনি তাকে খুন করেছেন। আপনি আর মিলি।'

অবাক চোখে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

চন্দন বলে চলেছে, 'গ্রীক ইন্টেলিজেন্স বিকেলে আমার সাথে

যোগাযোগ করেছিল। পুলিস বিভাগে ওদের লোক আছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরা করা হচ্ছে মিলিকে। আমাদের সম্পর্কে কতটুকু জানে সে, মাসুদ ভাই?'

'কিছুই জানে না,' বলল রানা। 'আমার নামটা কিভাবে উঠল?'

'অকুস্থলের কাছাকাছি ভাড়াটে গাড়ি। কেউ একজন লাইসেন্স নম্বর মনে রেখেছে। মেয়েটাকে তারা একজন পুরুষের সাথে ফিরতে দেখেছে। "অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল", এভাবে ব্যাখ্যা করছে পুলিস।'

'আমি কে তা ওরা জানে?'

'এখনও জানে না। জানতে পারলে আপনার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করবে ওরা। গ্রীক ইন্টেলিজেন্সকে ধরতে পারি আমরা, ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক মোটামুটি ভাল, কিন্তু পুলিস বিভাগের ওপর ওদের কোন প্রভাব নেই। গ্রেফতার করতে পারলে পুলিস আপনার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেবে, বিচার করে ছাড়বে। তবে যদি গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে পারেন...'

'গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের অনেক উপকার করেছি আমরা অতীতে, ওরা কোন সাহায্যে আসবে না?'

'আসবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে, গ্রীস থেকে আপনাকে যেন সরিয়ে দেয়া হয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল চন্দন। 'গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের বন্ধুরা বলছে, মন্ত্রণালয়কে বোঝাবার জন্যে জোরাল দু'একটা যুক্তি তাদের হাতে থাকা দরকার।'

'ওদেরকে বলো, অ্যারোনাফিস মারা না-ও গিয়ে থাকতে পারে।'

'সবাই ধরে নিয়েছে, নির্ঘাত মারা গেছে সে। তা না হলে লাশটা কার?'

'কি জানি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'তবে, একটা ইয়ট আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, আমাকে আর মিলিকে। সার্ফ-লাইনের সামনে ডাইভ দিচ্ছিলাম আমি। আমার কেন যেন মনে হয়, ইয়টের লোকটা অ্যারোনাফিসই ছিল।'

'ক্রিমিনালরা নয় কেন? আপনাকে যখন মারার চেষ্টা করছিল?'

'ক্রিমিনালরা দায়ী নয় বলে মনে হয় এই জন্যে যে ভিলায় তারা কোন গাড়ি ফেলে যায়নি। আরেকটা কথা, একশো ফুটি একটা ইয়ট চুরি করা অত্যন্ত ঝামেলার কাজ, সেটাকে ফেলে পালানোও সহজ নয়। খুন করার অস্ত্র হিসেবেও ওটা ভোঁতা আর অচল। ইয়ট থামিয়ে আমাদেরকে গুলি করেনি কেন তারা? ভিলায় তো তাই করেছে। ইয়টটা এমনকি আমরা মারা গেছি কিনা দেখার জন্যে একবার চক্করও দিল না।'

'তাহলে ব্যাপারটা…?'

'সমস্ত লক্ষণই বলছে, জান নিয়ে পালাচ্ছিল কেউ, সামনে কি আছে না আছে দেখার মানসিকতা তার ছিল না।' সোফায় হেলান দিল রানা।

'ব্যাপারটা তাহলে কি রকম দাঁড়াচ্ছে? শুরু থেকেই কেউ একজন অ্যারোনাফিসকে খুন করার চেষ্টা করছে?'

'হতে পারে। একটা নয়, আমরা সম্ভবত দুটো ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা যখন নিকোলাই প্যাসিমভকে খুঁজছি, আরেকটা দল তখন অ্যারোনাফিসকে খুন করার চেষ্টা করছে।'

নাক চুলকাল চন্দন। 'এথেন্স ছাড়ার আগে আমি একটা তথ্য পেয়েছি, মাসুদ ভাই। ভাবছি সেটার সাথে ব্যাপারটার সম্পর্ক

আছে কিনা।’

‘কি তথ্য?’

ক্ষীণ হাসল চন্দন। ‘আমরা জানতে পেরেছি, নেমিসিসের মালিক অ্যারোনাফিস।’

‘দুটো ঘটনা দেখছি এক হয়ে যাচ্ছে,’ বলল রানা।

লাউঞ্জের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দন, তার চোখ সরু হয়ে গেল। ‘মাসুদ ভাই, বিপদ!’ বিড় বিড় করে বলল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, গ্রীক পুলিসের ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘদেহী একজন অফিসারকে দেখতে পেল। লোকটার নাকের নিচে বিশাল গোঁফ।

অফিসারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলি, তার লম্বা করা হাতের আঙুল সরাসরি রানার দিকে তাক করা।

পাঁচ

লাফ দিয়ে সোফা ছাড়ল রানা, পিছনের দরজার দিকে ছুটল। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল একটা চেয়ার, একজন ওয়েটার পিছিয়ে যেতে গিয়ে আছাড় খেলো।

‘স্টাটামাটিস্ট! স্টপ!’ দুই ভাষাতে গর্জে উঠল অফিসার।

পিছনে চন্দনের পায়ের আওয়াজ পেল রানা। খোলা একটা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এল ওরা। মান্ধাতা আমলের একটা ল্যাম্পপোস্টে টিম টিম করে আলো জ্বলছে, কাঁকর ছড়ানো সরু গলিটা দেখা গেল কিছুদূরে।

কোন কথা হলো না, চন্দন ছুটল একদিকে, আরেকদিকে রানা। পুলিসের তাড়া খেলে কি করতে হয়, দু'জনেরই জানা আছে। সামনে এক প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি দেখে তর তর করে কয়েক ধাপ নেমে পড়ল রানা, এই সময় লাউঞ্জের দরজা সশব্দে খুলে গেল ওর পিছনে। ছিটকে বেরিয়ে এল পুলিস অফিসার, তার ক্যাপের কার্নিশে ঢাকা পড়ে আছে চোখ। একটা কব্জি ধরে মিলিকে টেনে আনল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, মিলি কোন রকম বাধা দিচ্ছে বলে মনে হলো না। গ্রীক অফিসার কি যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। মিলি উত্তর দিলেও, শুনতে পেল না রানা।

গলির ভেতর কিছুই নড়ছে না।

পাহাড়ের নিচে, ক্রেন বহুল হারবার অসংখ্য বোটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একটানা বাতাসে নুয়ে পড়েছে পামগাছগুলো, যদিও পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকায় রানার গায়ে কোন বাতাস লাগছে না। চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করছে রানা। গলি থেকে ওর নাকে উঠে আসছে আবর্জনা আর মরা বিড়ালের গন্ধ।

রানা জানে, অফিসারের কাছ থেকে মিলিকে ছিনিয়ে আনতে হবে ওর।

রানার বিশ্বাস, ওর চেহারাটা ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি অফিসারের। তবে ওর সাথে মিলি থাকলে, ব্যাপারটা হবে

পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পতাকা ওড়ানোর মত। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে কোন উপায় নেই। মিলিকে ওর দরকার। নেমিসিস আবার অদৃশ্য হবার আগে একমাত্র মিলিই পারে ওকে সুয়েজ খালে পৌঁছে দিতে।

গলিটা পেরুচ্ছে অফিসার।

সিঁড়ির আরও কয়েকটা ধাপ নিচে নেমে ল্যান্ডিঙের কোণে আড়াল নিল রানা।

অফিসার বুঝতে পেরেছে, গলির শেষ মাথায় পৌঁছুনোর সময় পায়নি রানা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে, দ্রুত ডানে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপগুলো অস্বাভাবিক চওড়া।

পাঁচ ছ'টা ধাপ নেমে এসে থামল অফিসার, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

মিউনিসিপ্যালিটির বাগানে গানের আসর বসেছে, লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের দেশাত্মবোধক গান। গলির মুখের কাছ থেকে একটা ভেসপা স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। গলি দিয়ে হেঁটে গেলেন ঢিলে জোব্বা পরা এক মৌলভী, মসজিদটা কাছেই। তাঁর পিছু পিছু মাথায় তরকারির ঝাঁকা নিয়ে হেঁটে গেল একজন ফেরিওয়ালা।

চন্দন কোথায় লুকিয়েছে রানা জানে না। তবে কাছাকাছি কোথাও হবে বলে ধারণা করল ও। রানা ছুটলে, সে-ও ছুটবে। কিংবা চন্দন ছুটলে, ছুটবে রানাও। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কে আগে পালাবার চেষ্টা করবে?

অফিসারের কোমরে পিস্তল রয়েছে।

আরেকবার পিছন দিকে তাকাল অফিসার, এই সুযোগে বাকি ধাপ ক'টা টপকে নিচে নেমে এল রানা। এটা আরও একটা সরু

গলি।

পায়ের শব্দ হলো। অফিসার মিলিকে নিয়ে নামছে।

ল্যান্ডিঙে পৌঁছে থামল অফিসার। এদিক ওদিক তাকাল মিলি।

একটা ডাস্টবিনে লাথি মারল রানা, উল্টে পড়ল সেটা, তারপর ছুটল। হুঙ্কার ছাড়ল অফিসার, তারপর রানার উল্টোদিকে ছুটল, কারণ প্রথম গলি থেকে চন্দনের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে।

দ্বিতীয় গলি ধরে খানিকদূর ছুটে বাম দিকে বাঁক ঘুরল রানা, বিশগজ এগোল, বেরিয়ে এল ব্যস্ত চৌরাস্তায়, ওর হোটেলের সামনে।

ছোটার গতি কমাল রানা, দেখল এরইমধ্যে চারদিকে লোকজনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটা ট্যাক্সি থেকে হোটেলের সামনে আরোহীরা নামল, তাদের মধ্যে একটা মেয়েকে মনে হলো মাতাল। কৃত্রিম ঝর্নার কাছ থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল একটা হুইসেল। সতর্কতার সাথে ওর দিকে এগোল দু'জন ইউনিফর্ম পরা পুলিস। রানা বুঝল, হোটেলের সামনেটা পাহারা দিচ্ছিল তারা। গলি থেকে নিশ্চয়ই তারা ওকে চৌরাস্তায় ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

ট্যুরিস্টদের শহর, ইতিমধ্যে খুলে গেছে দোকান-পাট, দোকানের সামনে ফুটপাতের ওপর স্তূপ করা হয়েছে মালপত্র। সির‍্যামিক, আইকন, ছুরি, খেলনা, অলংকার, রেডিও, কি নেই। পথিকদের পাশ কাটিয়ে ছুটছে রানা, ফুটপাতে বেরিয়ে আসা একটা কফি শপের দুটো চেয়ার ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। সমানে চিৎকার করছে পুলিস দু'জন, রানাকে ধাওয়া করে মাঝখানের

দূরত্ব অনেক কমিয়ে এনেছে তারা।

অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিলের একটা স্তূপ ফেলে দিল রানা। উল্টে দিল পীচ ফল আর আপেল ভর্তি একটা গাড়ি। পিছনে মহা শোরগোল শুরু হলো। বিশ গজ এগিয়ে ঝট্ করে একটা খোলা দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল ও।

দোকানের পিছন থেকে হাসিমুখে এগিয়ে এল তুর্কী টুপি পরা দোকানদার। মোটাসোটা লোক সে, জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে। 'বলুন, মঁশিয়ে? আপনার জন্যে কি করতে পারি?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করল সে।

'আসসালামোআলায়কুম,' বলল রানা। 'পিছনের দরজাটা কোন্ দিকে বলুন তো? একটু বাথরূমে যাওয়ার দরকার ছিল।'

সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'কি!'

আবার বলল রানা।

বিরক্ত হলো দোকানদার। 'দুঃখিত, ট্যুরিস্টদের জন্যে বাথরূমের কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। কিছু কিনবেন কিনা বলুন।'

'কিনব, তবে পরে,' বলে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা।

'এই ট্রে-টা দেখুন, সিনর। সোলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট...'

হাত বাড়িয়ে লোকটার শার্টের কলার চেপে ধরল রানা। 'পিছনের দরজাটা দেখান! জলদি!' বলে এক ধাক্কায় দোকানের একধারে তাকে ফেলে দিল ও। চারদিক থেকে ধসে পড়ল ছাতা, বাসন-পেয়ালার স্তম্ভ ইত্যাদি।

'এদিকে! এদিকে!' মেঝেতে পড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ককিয়ে উঠল দোকানদার। 'ইয়া আল্লাহ্!'

কাউন্টার টপকে ভেতরে ঢুকল রানা, লোকটাকে হ্যাঁচকা টান

দিয়ে তুলল। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা আরেক কামরায়, সেখান থেকে ছোট্ট এক পাঁচিল ঘেরা উঠনে। পানির পাইপ থেকে পানি বেরুচ্ছে, একটা মেয়ে কাপড় ধুচ্ছে বালতি সামনে নিয়ে। মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হতে মোটা দোকানদার কপালে করাঘাত করল। বুট জুতোর শব্দ শুনে বোঝা গেল দোকানের ভেতর ঢুকে পড়েছে পুলিস।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, দু'কোমরে হাত রেখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল।

অন্ধকার একটা কামরায় ঢুকল রানা। গ্রীজ, মশলা আর কয়লার গন্ধ ঢুকল নাকে। এটা সেটার সাথে হোঁচট খেলো ও। একটা দরজা পেরোল, একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠল। বেরিয়ে এল সমতল ছাদে। টাঙানো রশির সাথে গাঢ় রঙের কাপড়চোপড় ঝুলছে, পত পত করছে বাতাসে। মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে হোটেলটা।

নিচতলা থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল মেয়েটার। দু'জন পুলিসের ধমকে চুপ করল সে।

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা হাত তুলল দোকানদার, 'ওদিকে!'

সিঁড়িটা দেখতে পেল রানা, বাড়ির গা বেয়ে সেই গলিটায় নেমে গেছে, হোটেল থেকে যেখানে প্রথম বেরিয়ে এসেছিল ও।

দ্রুত, নিঃশব্দে নেমে এল রানা, জানে বাড়ির ভেতর থেকে পুলিস দু'জনও যে-কোন মুহূর্তে ছাদে উঠে আসবে। গলিতে নেমে সামনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। হাসল আপনমনে।

পাথুরে সিঁড়ির গোড়ায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলি, চেহারা দেখে মনে হলো কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

তার সামনে যেন আকাশ থেকে পড়ল রানা, খপ্ করে কব্জিটা

চেপে ধরল, তারপর সজোরে টান দিল।

'রানা!' ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকল মিলি।

'চুপ!'

গলি ধরে খানিকদূর এগিয়েই বাঁক ঘুরল রানা। তুর্কী এলাকায় সরু গলিগুলো গোলক ধাঁধার মত, একের পর এক বাঁক নিয়ে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলল ও। কোন কোন গলি নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা, কোনটায় সাবেকী আমলের লোহার ল্যাম্পপোস্ট দেখা গেল, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। বিশাল, আকাশছোঁয়া একটা পাঁচিলের সামনে বেরিয়ে এল ওরা। এদিকে কোন ফুটপাত নেই। পিছন থেকে ভেসে এল পুলিসের হুইসেল।

রানার সাথে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছে মিলি।

দু'দিকে আকাশছোঁয়া পাঁচিল, মাঝখানটা যেন পাতালপুরী। আলো এত কম যে চওড়া রাস্তাটার প্রান্ত দুটো কতদূরে বোঝা গেল না। হঠাৎ জোরে নাক টানল রানা। অচেনা ফুলের একটা গন্ধ পেয়েছে ও।

মনে হলো, বাম দিক থেকে বাতাস এসে লাগল ওর গায়ে। মিলিকে নিয়ে হন হন করে সেদিকে এগোল ও। একটু পরই একটা বাগান দেখা গেল। বাগানের মাঝখানে পথটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। পচা ফলের গন্ধও পেল রানা। পায়ের চাপে থেঁতলে গেল দু'একটা। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখল ওরা। নিচের দিকে নেমে গেছে।

ধাপ বেয়ে নামার সময় হোঁচট খেলো মিলি, খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল রানা। এই সময় ভাল করে তার দিকে একবার তাকাল ও। দেখা হবার পর থেকে কোন কথা বলেনি সে, একবার শুধু ওর নামটা উচ্চারণ করেছে। এখনও তার মুখ থেকে কোন

শব্দ বেরুল না। তবে রানার বাহুটা সজোরে খামচে ধরেছে। চোখ দুটো বিস্ফারিতই বলা চলে। কাঁদছে না বটে, তবে ভয়ে একেবারে সিঁটকে আছে।

হঠাৎ বাঁক নিয়েছে সিঁড়িটা, সামনে নিরেট দেয়াল। দেয়ালের গা বেয়ে আরও কয়েকটা ধাপ নেমে গেছে, চারদিক ঘেরা জায়গাটার সিলিং খুব নিচু, হাত উঁচু করলেই ছোঁয়া যাবে।

থমকে দাঁড়াল রানা, তারপর সিঁড়ির গোড়া থেকে গাঢ় ছায়ায় সরে এল। গানের শব্দ, যানবাহনের আওয়াজ, সবই যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে।

চঞ্চল পানির শব্দ শুনে বোঝা গেল, পাতালের এই উঠনের কোথাও একটা ঝর্না আছে।

ওপরের গেটটাকে পাশ কাটিয়ে গেল ছুটন্ত একজোড়া পা।

ছায়ার আরও ভেতর দিকে সরে এল রানা, হাত বাড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে পাথুরে দেয়াল ছুঁলো। কর্কশ আর ঠাণ্ডা লাগল দেয়ালটা।

ভিজে শার্টটা বগলের কাছে চট চট করছে। গায়ে সেঁটে রয়েছে মিলি, ও একটু নড়লে আরও কাছে সরে এসে ওর শরীরে সেঁধিয়ে পড়তে চাইছে। একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল রানা। নারীদেহের অমূল্য সম্পদ বাঁক আর উত্থানগুলো অনুভব করতে পারছে। দীঘল ঊরুর চাপ লাগল পায়ে। বদ্ধ জায়গাটার বাতাস গরম আর ভাপসা।

রানা অনুভব করল, মিলির একটা হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল। চোখ নামিয়ে নিখুঁত বৃত্তাকার মুখটার দিকে তাকাল ও। আলগা চুলের কয়েকটা তার গালে লেগে রয়েছে, চকচক করছে সিল্কের মত।

'রানা…,' মিলির ঠোঁট দুটো উঠে এল রানার মুখের দিকে।

'চুপ! নোড়ো না!' চাপা কণ্ঠে বলল রানা, তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে।

মিলির আলিঙ্গন কঠিন হলো, তার শরীরের চাপে আরও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল। রানার বুকে মুখ ঘষল সে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভেবেছ, আমি তোমার সাথে বেঈমানী করেছি?'

'পুলিসকে নিয়ে এল কে?'

'দেখে যা মনে হলো, ব্যাপারটা তা নয়।'

'হুম।' পিছন দিকে তাকাল রানা। সিলিঙের নিচে গাঢ় অন্ধকার, দূরে কি আছে বোঝা গেল না। পুলিস আসছে কিনা শোনার চেষ্টা করল ও। ওর পাঁজরে মিলির হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।

আবার কথা বলল মিলি, 'আমাদের কি এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে বিপদ আরও বাড়তে পারে, জানো তো?'

'কি হবে সেটা পরে ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'তার আগে কি ঘটেছে তাই বলো।' মুখ নামিয়ে মিলির দিকে তাকাল ও। 'তুমি এলে কেন? জেদ ধরতে পারতে, চিৎকার করতে পারতে।'

'ভেবেছ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেছি আমি?' ঝাঁঝের সাথে বলল মিলি। 'জানো, ওরা আমার ওপর কি ধরনের টরচার করেছে? গায়ে শুধু হাত তোলেনি, কিন্তু এমন সব ভয় দেখিয়েছে…আমি যে এখনও হার্টফেল করিনি সেটাই আশ্চর্য!'

'আমার সাথে চলে এলে কি মনে করে? ধস্তাধস্তি করতে পারতে।'

‘কি করতে তাহলে তুমি?’

‘মারতাম, সম্ভবত। অজ্ঞান করে টেনে আনতাম,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা। ‘তুমি আমাকে মিশরে নিয়ে যাচ্ছ। আজ রাতে। চাও আর না চাও।’

‘তোমার সাথে জড়িয়ে পড়েছি আমি, রানা,’ বলল মিলি। ‘প্রথমবার তোমাকে দেখেই সেটা আমি টের পেয়ে গেছি। আমাদের নিয়তি একসুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে, তুমি বুঝতে পারছ না? দেবতারা তাই চাইছেন।’

‘জিয়াস আর তাঁর দলবলের ওপর তোমার দেখছি আজও বিশ্বাস আছে।’

‘অন্তত অবিশ্বাস করি না। এক সময় তো সবারই মঙ্গল করেছেন তাঁরা।’

মুখ তুলে অন্য দিকে তাকাল রানা। ‘তুমি দেখছি বদ্ধ একটা পাগল!’

ইমার্জেন্সী বেল-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে, সাইরেনের মত। শিউরে উঠল মিলি, রানার গলা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল।

‘সম্ভবত আরও পুলিস আনা হয়েছে,’ বিড় বিড় করল রানা।

‘ওরা আমাকে কস দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়েছে,’ কাঁপা গলায় বলল মিলি। ‘ওখানে একটা জেলখানা আছে, কিছুদিন থাকলে নাকি মানুষ পাগল হয়ে যায়।’

‘তুমি আমাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছ, কিন্তু তবু তোমাকে ক্ষমা করতে হবে আমার, এ-ধরনের কিছু বলতে চাইছ, নাকি?’

খানিক পর জবাব দিল মিলি, ‘আমি কোন অন্যায় করিনি, কাজেই ক্ষমা চাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না।’

'পুলিসকে তুমি কি বলেছ?'

'তুমি যা বলতে বলেছ। ভিলায় যখন আগুন লাগে আমি তখন সাঁতার কাটছিলাম। ফেরার আগে কিছুই আমি দেখিনি বা শুনিনি। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিফট নিয়ে শহরে আসি, খবর দিই পুলিসে।' রানার দিকে চিন্তিত মুখে তাকাল মিলি। 'কিভাবে যেন ওরা জানে কার সাথে শহরে এসেছি আমি। ভিলা থেকে আমরা একসাথে রওনা হই, তা-ও জানে ওরা। বাগানের সেই বুড়ো মালীটাই সম্ভবত বলে দিয়েছে ওদেরকে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমাদের ওপর তার কোন আগ্রহ বা নজর নেই। বুড়ো একজন মালী, গাড়ির নম্বর পর্যন্ত মুখস্থ করে রাখল?'

'তা না হলে পুলিস জানল কিভাবে?'

'সম্ভবত অজ্ঞাতনামার ফোন কল থেকে। যারা আগুন ধরিয়েছে তাদের কেউ হতে পারে। তারা হয়তো ঝোপের ভেতর সিমকাটা আগেই দেখেছিল।'

'তোমাকে তারা ফাঁসাবার চেষ্টা করবে কেন?'

মিলির সরল প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ওরা ফাঁসাবার চেষ্টা করায় আমার কাজ সহজ হয়নি, হয়েছে কি? ওদের ভাগ্য ভাল হলে, পুলিস আমাকে ধাওয়া করে দ্বীপটা থেকে ভাগিয়ে দেবে। খুনি পালিয়েছে এ-কথা জানার পর পুলিস আর কেসটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবে না। আসল খুনিরা বেঁচে গেল।'

'কারা ওরা?'

'তোমার জানার কোন দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, মানুষ তো আর বাতাসের ওপর রাগ করতে পারে না!'

‘বাতাসের সাথে তাদের খুব একটা পার্থক্যও নেই আসলে,’ বলল রানা। ‘তাদের অস্তিত্ব তুমি অনুভব করতে পারবে, কিন্তু ধরতে পারবে না।’

‘আ-আমার…আমার মন খুব খারাপ লাগছে,’ বিষণ্নসুরে বলল মিলি।

‘অ্যারোনাফিসের জন্যে?’

‘বন্ধু হিসেবে খুব ভাল ছিল কোস্টাস।’

‘আশা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তোমার দিকে অস্ত্র তোলে না।’

‘তুললে ক্ষতিটা কি? উত্তাপ, উত্তেজনা, আগুন, ঝুঁকি, বিপদ আর ভালবাসা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ আছে?’

‘গলা নামাও,’ বলল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মিলির দিকে। অন্ধকারেও তার মুখটা নিখুঁত পুতুলের মত সুন্দর। লোভ হলো ওর, সাথে সাথে ইচ্ছাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। ‘চলো, কেটে পড়ি,’ বলল ও।

‘কিন্তু পুলিস…?’

‘আরও নিরাপদ সময় পাব মনে করি না।’

রানার গলা ধরে ঝুলে পড়ল মিলি। ‘আমি নিরাপত্তা চাই না।’ মুখ তুলে রানার চোখে তাকাল সে। ‘নিরাপত্তা চাইলে কি তোমার সাথে প্লেনে থাকা সাজে আমার?’

‘নিরাপত্তা চাও না। তাহলে কি চাও?’

‘তুমি বোঝো না?’ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো মিলি, রানার মুখে গরম নিঃশ্বাস ফেলল। গলির আবছা আলোয় তার কালো চোখ দুটো এক জোড়া দামী পাথরের মত জ্বলতে দেখল রানা। নারীসুলভ একটা গন্ধ নেশা ধরিয়ে দিল ওর মনে। মিলির

ফ্যাকাসে লাল মুখের চুমো ভেজাভেজা আর উত্তপ্ত, ঠোঁট জোড়া ভয়ানক অধৈর্য, পাথুরে দেয়াল আর রানার মাঝখানে সরে গেল সে। তার আবেগের নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিজেকে দমন করল রানা, মিলির কানে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করল, 'ইটস ওনলি দা এক্সাইটমেন্ট অভ ডেঞ্জার। বিপদের সময় অনেকেরই এরকম প্রতিক্রিয়া হয়।'

'না-না!' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল মিলি। 'আমেরিকানদের ভাষায় বলি, ইউ টার্ন মি অন। তোমাকে আমি ভাল করে চিনি না, কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটা পৌরুষ আমি লক্ষ করেছি, মেয়ে হয়ে ধরা না দিয়ে আমার কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু অ্যারোনাফিস?'

'সে শুধুই আমার বন্ধু ছিল, তার দ্বারা আমি কখনও উত্তেজিত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া, আমি বেঁচে আছি, সে মারা গেছে।'

'আর যদি বেঁচে থাকত?'

'কথা বোলো না।' রানার কালো চুলের ভেতর কিলবিল করতে করতে ঢুকে গেল মিলির আঙুলগুলো। পাতলা কাপড়ের ভেতর তার শরীরের কোমল উত্তাপ পাগল করে তুলল রানাকে।

দু'জোড়া ঠোঁট এক হতে যাচ্ছে, বিড়বিড় করে উঠল রানা, 'এখানে? গলির মাঝখানে একজোড়া বিড়ালের মত?'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই!' চুমো খাওয়ার সময় গোঙাল মিলি। 'প্লিজ!'

রানা জানে, এই বিলাসিতা ওকে মানায় না। নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করল ও, শরীরটা একটু একটু কাঁপছে।

'কি হলো?' অবাক হয়ে গেছে মিলি।

‘কিছু না। চলো এয়ারপোর্টে যাই।’

‘তুমি আমাকে পছন্দ করো না?’

‘করি,’ থমথমে সুরে বলল রানা। ‘তবে আগে কাজ সারা দরকার, তারপর অন্য কিছু। চলো।’

‘তুমি আমাকে আরও বেশি আকর্ষণ করছ,’ অভিযোগের সুরে বলল মিলি। ‘বাড়িয়ে তুলছ জেদ। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব,’ শেষ কথাটা হুমকির সুরে বলল সে।

রানা কোন জবাব দিল না।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল ওরা। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, আরও অনেক যুবক-যুবতীর মত। প্রধান সড়ক লোকে লোকারণ্য, ফুটপাতে আর দোকানগুলোয় পুরোদমে শুরু হয়েছে কেনা-বেচা। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ওদের, আশপাশে কোথাও ইউনিফর্ম দেখা গেল না।

কিন্তু দুর্গ এলাকা ছেড়ে বেরুতে গিয়ে প্রতিবার বাধা পেল ওরা। প্রতিটি গেটে লোকজনকে থামিয়ে পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করছে পুলিস। চুপিসারে সরে আসতে হলো ওদেরকে। রানা উপলব্ধি করল, গ্রেফতার এড়াবার চেষ্টা করায় পুলিস ধরে নিয়েছে অ্যারোনাফিসের হত্যাকাণ্ডের জন্যে ও-ই দায়ী।

তবে ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে।

কর্তৃপক্ষ এখনও রানার সাথে চন্দন সরকারকে জড়াতে পারেনি। তুর্কী পাড়ার দক্ষিণ গেটে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। ‘আমি জানতাম, মাসুদ ভাই, শেষ পর্যন্ত এদিকে আপনাকে আসতে হবে একবার,’ হাসিমুখে বলল সে। ‘সব গেটেই আছে ওরা, এটাতেও।’ পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল সে।

ভাড়া করা একটা ফোর্ড সরু এক নির্জন গলির ভেতর আগেই

দাঁড় করিয়ে রেখেছে চন্দন। পিছনের বনেট তুলে ভেতরে মিলিকে তুলল, তাকে গেটের বাইরে রেখে ফিরে এল চন্দন। একইভাবে রানাকেও পার করে আনল সে। দু'জন মাত্র পুলিস ডিউটি দিচ্ছে, পথচারীদের ওপরই তাদের বিশেষ সন্দেহ। গাড়িগুলোও চেক করল, তবে পিছনের বনেট খুলল না। দ্বিতীয়বার গেট পেরুবার সময় ফোর্ডটাকে তারা থামালই না।

সরাসরি ওদেরকে মানড্রাকি হারবারে নিয়ে এল চন্দন, নামিয়ে দিল শহরের প্রধান ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে। মিলিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল রানা। খোলা জানালার দিকে ঝুঁকে চন্দন বলল, 'ভালই হলো আপনারা চলে যাচ্ছেন...'

'প্ল্যানটা বদলাতে হয়নি, সেজন্যে আমি খুশি,' বলল রানা।

'ভাল বলছি এই জন্যে যে গ্রীক ইন্টেলিজেন্স কেসটা নিয়ে কাজ করার সময় পাবে,' বলল চন্দন। 'আমরা যে অ্যারোনাফিস হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নই, এটা ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি। পুলিশকে বোঝাবার জন্যে ওরা এখন তদন্ত শুরু করবে। আপনি ফিরে আসার আগেই সম্ভবত আসল রহস্য বের করে ফেলবে ওরা।'

'ওরা ব্যর্থ হলেও ফিরতে হবে আমাকে,' বলল রানা।

'জানি। ভাল কথা, মাসুদ ভাই...,' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল চন্দন। 'এয়ারপোর্ট লকারের চাবি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, নেমিসিস কোথায় আছে জানার পর আপনি জাহাজটায় উঠতে চাইবেন।'

'কি আছে লকারে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল চন্দন। 'ধরে নিন, বি.সি.আই-এর তরফ থেকে ছোট্ট উপহার।' মিলির দিকে তাকাল সে। 'মিস পুলটিস?'

‘ইয়েস?’

‘রঁদেভো ক্লাবে তোমার অনুপস্থিতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? তুমি না গেলে কেউ যদি খোঁজ করে, যদি পুলিসে খবর দেয়?’

‘আরে, তাই তো!’

‘একটা মেসেজ পাঠিয়ে যদি বলা হয়, তুমি অসুস্থ, চলবে?’

‘প্লীজ, খুব ভাল হয়!’

‘ঠিক আছে, ওদিকটা দেখব আমি। গুড ফ্লাইং।’ রানার দিকে ফিরল চন্দন। ‘গুডলাক, মাসুদ ভাই।’

কোন ঘটনা ছাড়াই পশ্চিম উপকূল ধরে পনেরো কিলোমিটার পেরিয়ে এল ট্যাক্সি। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের সামনে নামল ওরা। সন্দেহ নেই, পুরানো শহরের বাইরেও রানা আর মিলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে পুলিসকে, তবে পুলিস সম্ভবত আশা করছে না প্রাইভেট কোন প্লেন নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা।

ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে টার্মিনাল ভবনে ঢুকল ওরা, পুলিস থাকলেও ওদেরকে থামাল না। মেইন লবির দিকে না গিয়ে হাত ধরাধরি করে প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন লাউঞ্জে ঢুকল দু'জন, বেরিয়ে এল টারমাকে। দিনের এই সময়টায় ব্যস্ততা কম, যদিও লন্ডন আর এথেন্স থেকে দৈনন্দিন ফ্লাইট আছে, আছে প্রায় বারোটা দেশ থেকে অসংখ্য ডিরেক্ট চার্টার ফ্লাইট। হকার ট্রাইডেন্ট, ৭২০ ও ৭২৭ বোয়িং পার্কিং অ্যাপ্রনে ঝলমল করছে। একটা হ্যাঙ্গার ঘুরে অ্যারোনাফিসের সাদা আর নীল লিয়ার জেটের দিকে এগোল ওরা।

‘সম্ভবত প্লেনে বসে আছে জর্জ,’ বলল রানা।

‘হ্যাঁ, সে-ও তো যাচ্ছে আমাদের সাথে, তাই না?’

‘লাউঞ্জে তাকে দেখলাম না। সাথে করে একটা জিনিস আনার কথা তার।’

‘প্লেনে থাকবে কিভাবে? ওটায় তো তালা দেয়া।’

‘তাহলে আলো জ্বলছে কেন?’

দাঁড়িয়ে পড়ল মিলি, মুখ তুলে প্লেনটার দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে ফিরল সে।

‘এসো, দেখা যাক,’ বলল রানা।

প্লেনের ভেতর প্রথম রানাই ঢুকল, ঢুকেই দেখতে পেল ডাচ জর্জকে। কেবিনের পিছন দিকে একটা কাউচে বসে আছে সে, মুখটা আরও যেন সরু হয়ে গেছে। স্বচ্ছ পানীয় ভরা একটা গ্লাস রয়েছে তার সরু গোঁফের ঠিক নিচে। পায়ে ডেক শূ, গায়ে লাইটওয়েট জাম্পসুট, ব্রেস্টপকেটের ওপর লিনেন দিয়ে তৈরি বহুরঙা নকশা। রানাকে দেখেই একটা ভুরু কপালে তুলল সে, ঈগলসুলভ চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ‘রানা,’ বলল সে, ‘এসো, তোমার সাথে মি. কোস্টাস অ্যারোনাফিসের পরিচয় করিয়ে দিই। মি. কোস্টাস অ্যারোনাফিস, মি. মাসুদ রানার সাথে পরিচিত হোন।’

ছয়

'কোস্টাস!' রানার পিছন থেকে চিৎকার করল মিলি, উল্লাসে অধীর কণ্ঠস্বর।

'আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! আমি মারা গেছি ধরে নিয়ে এই লোকের সাথে পালিয়েছিলে তুমি!'

বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত কঠিন ভাষায় কথা বলল অ্যারোনাফিস, তবে তার উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয়।

একই ভাষায় পাল্টা জবাব দিল মিলি, শুদ্ধ উচ্চারণে, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ! আমি কি তোমাকে ইয়ট চাপা দিয়ে মারতে চেয়েছি?'

'তুমি বলেছিলে, আমার নাকি ঈর্ষাবোধ করার কোন কারণ নেই–কিন্তু এখন কি দেখছি?'

'কথাটা বলেছিলাম সকালে।' সুগঠিত নিতম্বে হাত রাখল মিলি। 'তোমার মনে নোংরা সন্দেহ ছিল, কাজেই যা প্রাপ্য তাই তোমার কপালে জুটেছে। যার যেমন চাহিদা তার তেমন প্রাপ্তি...'

'তারমানে আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়!' হাত দুটো মুঠো পাকাল অ্যারোনাফিস। 'তুমি আসলে একটা নষ্টা! ধরা দেয়ার ভান করে পুরুষদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করো! তোমার নতুন শিকার

কি তা জানে?' দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে তার।

'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই!' সরে এসে রানার পাশে দাঁড়াল মিলি, এক হাত দিয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'তোমাকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিয়ে আমি মারাত্মক ভুল করেছিলাম।'

'দাঁড়াও, সম্পর্ক নষ্ট করার আগে তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে!' গর্জে উঠল অ্যারোনাফিস, মারমুখো হয়ে মিলির দিকে এগিয়ে এল।

ঝট্ করে একটা হাত তুলে তার বুকে ঠেকাল রানা। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রীক কোটিপতি। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকাল।

তার আপাদমস্তক নিরীখ করল রানা। শক্ত-সমর্থ ছোটখাট কাঠামো, চৌকো কাঁধ, হালকা সবুজ ইটালির তৈরি সুট পরে আছে, সাদা শার্টটা মনোগ্রাম করা, গলায় বো টাই। রানা আন্দাজ করল, শার্টের নিচে বুলেটপ্রূফ ভেস্ট পরে আছে লোকটা। 'এক মিনিট,' বলল ও।

'সরে দাঁড়ান, মি. রানা,' কড়া সুরে হুমকি দিল অ্যারোনাফিস।

তার বুক থেকে হাতটা না সরিয়ে মিলির দিকে তাকাল রানা। 'যাও, ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করো,' বলল ও। 'অভ্যন্তরীণ কোন গন্তব্য হওয়া চাই, তা না হলে পাসপোর্ট চাইবে।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি শোনো...'

রানার হাত ঠেলে সামনে এগোতে চাইল অ্যারোনাফিস। 'আমার প্লেনে চড়ে কোথাও যেতে পারবেন না আপনারা!'

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?' মিলির দিকে তাকাল রানা। পিছু

হটে দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। অ্যারোনাফিসের বুক থেকে হাতটা নামিয়ে নিল রানা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'জানতে পারি, এ-সবের মানে কি?'

অ্যারোনাফিসের দিকে তাকিয়ে থেকে চাবিটা ডাচ জর্জের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। 'লকারে কি আছে নিয়ে এসো।'

নিঃশব্দে, চেহারায় কৌতুক নিয়ে, ওদেরকে লক্ষ করছিল জর্জ, চাবিটা লুফে নিয়ে দাঁড়াল সে, বলল, 'রিয়েলি, ওল্ড বয়, শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার জন্যে এখানে আমার থাকা দরকার ছিল।'

'বেরোও,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'নষ্ট করার মত সময় নেই।'

ওরা একা হতেই খেঁকিয়ে উঠল অ্যারোনাফিস, 'আপনাকে আমি জেলে ভরতে পারি, তা জানেন?'

'ইয়ট চাপা দিয়ে আপনি আমাদের মারার চেষ্টা করলেন কেন বলুন তো?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাজটা আপনারই, তাই না?'

'আপনার ব্যবসা কি, মি. রানা?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অ্যারোনাফিস।

রানাও তাই করল, 'আপনার ভিলায় ওরা কারা মারা গেল, মি. অ্যারোনাফিস?'

'আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

'ভেবেচিন্তে তৈরি করে রাখতে পারেন,' বলল রানা। 'কোন এক সময় উত্তর তো দিতেই হবে।'

'আপনার এত সাহস, আমাকে হুমকি দেন!' এক পা সামনে বাড়ল অ্যারোনাফিস, বিশাল সানগ্লাসের ভেতর চোখ দুটো

জ্বলছে।

‘নেমিসিস কয়েকশো মাইল অফ-কোর্সে এল কেন?’ জানতে চাইল রানা। ‘কেন অদৃশ্য হলো, তারপর কেন আবার উদয় হলো পোর্ট সাঈদে?’

অ্যারোনাফিসের সবুজাভ চোয়ালে লালচে একটা ভাব ফুটল। কপাল থেকে কাঁচাপাকা চুল সরাল সে। দুই ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা। জানতে চাইল, ‘এত সব আপনি জানলেন কিভাবে? আপনি নিশ্চয়ই কোন বিদেশী এজেন্ট। উচ্চারণ ভঙ্গি আমেরিকান হলেও, আপনি রাশিয়ানও হতে পারেন।’

‘হঠাৎ রাশিয়ানদের টানছেন কেন? ভিলায় রাশিয়ানরাই আপনাকে তাড়া করেছিল, তাই না?’

এই প্রথম নার্ভাস দেখাল অ্যারোনাফিসকে। ‘আ-আমি জানি না। ভ-ভ...আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। কোন দিকে না তাকিয়ে জান নিয়ে পালাতে শুরু করি...’

‘ইয়টে করে।’

‘হ্যাঁ, ইয়টে করে। পানিতে কেউ আছে কিনা দেখতেই পাইনি আমি, যীশুর কিরে।’

কেন যেন, লোকটার বলার ভঙ্গিটাই অবিশ্বাস্য লাগল রানার। ‘ওরা নিকোলাই প্যাসিমভকে ধরতে এসেছিল?’

‘কাকে ধরতে এসেছিল জানি না...ওদের ভয়ে সাগরেই থেকে যাই আমি। রাত নামার পর এখানে চলে আসি, প্লেন নিয়ে এথেন্সে চলে যাব বলে।’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যারোনাফিস। ‘যে-কোন মুহূর্তে আমার পাইলট চলে আসবে। আপনারা চলে গেলে আমি খুশি হই, মি. রানা। এখুনি, প্লীজ।’

‘যাবই তো,’ নির্লিপ্ত, আপোসহীন সুরে বলল রানা। ‘আপনার

প্লেনে করে।’

রানা থামতেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ডাচ জর্জ আর মিলি, লিয়ারজেট দুলে উঠল সামান্য। ফুয়েলের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে, সেই সাথে জেট টারবাইনের গুঞ্জন শুনতে পেল ও।

ঝট্ করে কোটের ভেতরে হাত ঢোকাল অ্যারোনাফিস, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় রানার কাছে হেরে গেল সে। রানার হাতের .৩৮-এর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গ্রীক কোটিপতি।

‘হাতের অস্ত্রটা সাবধানে বের করে পাশের সীটে রাখুন,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘কোনরকম চালাকি করলে, অকালে মারা পড়বেন।’

নির্দেশ মত কাজ করল অ্যারোনাফিস। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। হিসহিস করে উঠল তার কণ্ঠস্বর, ‘কর্তৃপক্ষকে সবই জানানো হবে!’

অস্ত্র নেড়ে দরজাটা দেখিয়ে দিল রানা, বলল, ‘সত্যি? কিন্তু আপনার বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাটা যে কর্তৃপক্ষকে জানাননি, তার কি হবে? ওখানে যে দু’জন লোক মারা গেছে, তার? আমার বরং বিশ্বাস, আপনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চান, আপাতত। আমার আরও বিশ্বাস, অত্যন্ত কৌশলে গোপন কিছুর সাথে নিজেকে আপনি জড়িয়ে ফেলেছেন, মি. অ্যারোনাফিস।’

‘এর জন্যে আপনাকে মূল্য দিতে হবে, মি. রানা!’ রাগে কাঁপছে অ্যারোনাফিস।

‘আপাতত তেল খরচটা আপনি দিচ্ছেন,’ বলল রানা। ‘ভাগ্য ভাল হলে, কাল আপনার প্লেন ফেরত পাবেন।’

‘গো টু হেল!’

‘নরকে যদি যাই, ওখানে গিয়ে দেখব আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আগেই পৌঁছে গেছেন আপনি।’

হ্যাচের সামান্য ভেতর থেকে রানার হাতের অস্ত্রটা টারমাক পর্যন্ত অনুসরণ করল অ্যারোনাফিসকে। ছোট্ট টেবিলে বসে ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটটা খুলল ডাচ জর্জ। ইতিমধ্যে পাইলটের সীটে বসে পড়েছে মিলি।

‘বাহনটাকে আকাশে তোলো,’ বলল রানা।

অভ্যস্ত হাতে টেক-অফ করার প্রস্তুতি নিল মিলি। একটা জানালার সামনে বসে টার্মিনাল ভবনের বিশেষ একটা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ওই পথেই অদৃশ্য হয়ে গেছে অ্যারোনাফিস।

মোড়ক খুলে বড়সড় একটা অলিম্পিক এয়ারওয়েজ ফ্লাইট ব্যাগ বের করল জর্জ, চেইন খুলে ভেতরটা দেখল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। ‘মাই গড! এ-সব জিনিস আপনি জোগাড় করলেন কিভাবে?’ বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল সে, দু’হাত দিয়ে ধরে ব্যাগ থেকে বের করে আনল ছোট আকারের একটা উজি সাবমেশিনগান।

রানা কোন জবাব দিল না। ব্যাগের ভেতর থেকে আরেকটা উজি বের করল, সাথে ছ’টা ম্যাগাজিন। মনে মনে চন্দনের প্রশংসা করল ও।

চিৎকার করে সীটবেল্ট বাঁধতে বলল মিলি, স্টার্ট দিল টারবোজেটে। রানওয়ে ধরে এগোল জেট, টেক-অফ করার ক্লিয়ার‍্যান্স রিসিভ করল ওরা। রাতের আকাশে উঠে পড়ল প্লেন।

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল রোডস-এর আলো, চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে এল ওরা, ছুটছে দক্ষিণ-পুব দিকে।

হাতের গ্লাসটা আরেকবার ভরে নিয়ে রানার দিকে তাকাল জর্জ, লম্বা হাতটা বাড়িয়ে ইঙ্গিতে সাবমেশিনগানগুলো দেখাল। 'আমার ধারণা, অভিযানে স্রেফ নাটকীয় ভাব আনার জন্যে এগুলো আমদানী করা হয়েছে, ঠিক কিনা?' জানতে চাইল সে।

'খুব সম্ভব ব্যবহার করার দরকার হবে না,' বলল রানা।

'প্রায় অপরাধের সমতুল্য বলতে হয়, ব্যবহার করা না হলে,' বিদ্রূপের সুরে বলল জর্জ। 'নিখুঁত, চকচকে, তৈরিও করা হয়েছে মানুষকে সাবাড় করার জন্যে, তাই না? ব্যবহারই যদি না করা হবে, এগুলো সাথে নেয়ার কি দরকার ছিল?'

'ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না, তা আমি বলিনি। তোমার কি মনে হয়, জাহাজে ওরা আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে? নেমিসিসে নিশ্চয়ই পঁচিশ-তিরিশজন লোক আছে...'

'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, গুরু। আমরা ন্যায়ের পথে আছি, মনের জোরই সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। দরকার হলে, ওগুলোর সাহায্যও নেব, কি বলো?'

লোকটা এরই মধ্যে মাতাল হয়ে গেছে কিনা ভাবল রানা। 'তুমি কি সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কথা ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কি! কেন? হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

'না, উজি সম্পর্কে বেশি বেশি কথা বলছ দেখে মনে হলো, ভয়-টয় পেলে নাকি!'

'দূর, কি ভাবো আমাকে তুমি? ভয় পাব কেন!'

ডাচ জর্জের মুখে কি যেন খুঁজল রানা। 'ভাল। এখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই।'

'আবহাওয়া একটা সমস্যা হতে পারে,' কো-পাইলটের সীটে রানা

বসার পর বলল মিলি।

'দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে।' তারাগুলোর দিকে তাকাল রানা, এত কাছে আর স্পষ্ট, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

'ওয়েদার ম্যাপ বলছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে একটা নিম্নচাপ পুব দিকে এগোচ্ছে। খামসিনকে ডেকে আনতে পারে ওটা।'

রানা জানে, খামসিন বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ মরুভূমি থেকে উত্তপ্ত বাতাস গিলে মিশরের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়ে ওটা, সগর্জনে বেরিয়ে আসে বালির মেঘ। খামসিন নামের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়টা দু'ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রীতে তুলে দিতে পারে, হারিকেনে রূপান্তরিত হয়ে গতি লাভ করতে পারে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। কতদিন স্থায়ী হবে তা-ও বলার উপায় নেই, একদিনও হতে পারে, আবার এক হপ্তাও হতে পারে। 'টার্গেট এরিয়ায় কখন পৌঁছুবে ওটা?' জানতে চাইল ও।

গাঢ়, পটলচেরা মিলির চোখ ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে ক্রোনোমিটারে সরে গেল। 'প্রায় আমরা যখন পৌঁছুব। ভাগ্য ভাল হলে, হাতে ঘণ্টাখানেক সময় পাব।'

'আর যদি আমাদের সাথেই বা আগে পৌঁছায়?'

'ল্যান্ড করা কঠিন হবে। অসম্ভবও হতে পারে। তবে আগে পৌঁছুবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু আমাদের তো আবার টেক-অফ করতে হবে।'

'তা বোধহয় আমি ম্যানেজ করতে পারব,' আশ্বাস দিল মিলি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল। প্লেন দ্রুতগতিতে উড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আকাশে স্থির হয়ে আছে ওরা। 'কোথায় উড়তে শিখলে তুমি?' এক সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

'গ্রীক এয়ারফোর্সে বাবা ছিল পাইলট, একটা স্কোয়াড্রনের

কমান্ডার,' ম্লান মুখে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল মিলি। 'চুয়াত্তর সালে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হলো, গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করল যারা তাদের মধ্যে বাবাও ছিল। গ্রেফতার করার পর জেলখানায় খুন করা হলো তাকে। একজন সামরিক অফিসার হয়ে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ হারাল আমার বাবা, কিন্তু রাজনীতিকরা কি করল, জানো? অভ্যুত্থানের নেতাদের সাথে এক টেবিলে বসে আপোস করে ফেলল, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল ক্ষমতা।' নাক বরাবর অন্ধকার আকাশে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'জানো, অভ্যুত্থানের খবরটা পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।'

'তুমি তাহলে বাপের কাছে শিখেছ।'

'বাবার ইচ্ছে ছিল, অবসর নেয়ার পর বাপ-বেটিতে একটা চার্টার কোম্পানী খুলব। সমস্ত প্ল্যান ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছিল। আর এক বছর পর অবসর নিত বাবা। জেলখানা থেকে খবর এল, একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ডিটেনশনে ছিল, সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ করা যায়নি।'

'তৃতীয় বিশ্বের সবখানে এ-ধরনের ঘটনা ঘটছে,' ম্লানসুরে বলল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত।'

'ওরা আমাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করল,' বলে চলেছে মিলি। 'আমেরিকায় চলে গেলাম আমরা। ভাল গাইতে পারত মা, চাকরি আর বিয়ে দুটোই জুটে গেল তার। গাইতে আমিও পারতাম, কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারলাম না, কারণ আমেরিকানরা যতটা না আমার গান শুনতে ভিড় জমাত, তারচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার লোভে। ওরা এত বেশি রোমান্টিক যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমি।'

'সেজন্যেই কি আবার গ্রীসে ফিরে এলে তুমি, ওদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে?'

হেসে উঠল মিলি। 'না, তা নয়। ইতিমধ্যে মেয়ে-ঘেঁষা আমেরিকানদের কিভাবে সামলাতে হয় তা আমি শিখে ফেলেছিলাম। ফিরে এলাম দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে যাচ্ছে দেখে। দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। ফিরে এসে ক্যাবারেতে নাম লেখালাম। এখনও গাইছি।'

'তুমি সত্যি খুব সাহসী মেয়ে,' বলল রানা। 'সংগ্রাম করতে জানো।'

'তবে নিকোলাই প্যাসিমভের মত মানুষদের সাথে আমার কোন তুলনা চলে না,' জবাব দিল মিলি।

'তুমি তাঁর নাম জানলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'আজ সকালে জর্জকে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি আমি। আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে আনব, রানা?'

ব্যাপারটা অস্বীকার করার আর কোন মানে হয় না, ভাবল রানা। 'তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'সবাই যতটুকু জানে। তিনিও একজন সংগ্রামী মানুষ, যদিও সশস্ত্র নন। অনেক সংকট আর ভরাডুবি থেকে উদ্ধার পেয়েছেন ভদ্রলোক।'

'তা ঠিক। পারমাণবিক শক্তিকে শুধু শান্তির কাজে ব্যবহার করা যাবে, এই নীতি সবাই যাতে মেনে চলে তার জন্যে আন্দোলন করছেন ভদ্রলোক। আমি যতটুকু জানি, সোভিয়েত সরকারের সাথে তাঁর কোন বিরোধ নেই। তিনি শুধু নিশ্চয়তা চান, সরকার যেন সোভিয়েত শাসনতন্ত্র আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়।'

‘অথচ খবরের কাগজে পড়েছি, তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কে.জি.বি. এজেন্টরা এমনকি মারধরও করেছে তাঁকে। গুজব রটেছে, তাঁকে নাকি পাগলাগারদেও পাঠানো হয়। তবে, সাহস হারাননি ভদ্রলোক। বোধহয় সেজন্যেই বেঁচে আছেন আজও।’

‘জোর করে বলা যায় না। তবে শিগ্‌গিরই জানতে পারব।’ সীটে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। নিঃসীম আকাশে কিছুই দেখার নেই, শুধু চাঁদের আলোয় প্লেনের ডানা আলোকিত হয়ে রয়েছে।

এ-পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সব কিছু ঘটেছে, ভাবল রানা। রোডস টাউনে পুলিস আর এয়ারপোর্টে অ্যারোনাফিস গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও, নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র কয়েক মিনিট পরে গন্তব্যে পৌঁছুবে ওরা।

খাল পেরুতে একটা কনভয় সময় নেয় পনেরো ঘণ্টা। সাধারণত একটা জাহাজকে তিন জায়গায় পুরোপুরি স্থিরভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে দুটো জায়গা হলো আল-বালাহ ও কিবরিট বাইপাস, দক্ষিণের গ্রেট আর লিটল বিটার লেক-এর মাঝখানে। তৃতীয় জায়গাটা হলো ইসমাইলিয়া, খালের মাঝখানে, ওখানে পাইলটরা সীট বদল করে।

এলাকার বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনার মধ্যে রাখলে, আল-বালাহ সবচেয়ে আদর্শ বাইপাস। পোর্ট সাঈদ আর বাংলাদেশ দূতাবাস, দুটোই কাছাকাছি। বিপদে পড়লে সাহায্য পাওয়া যাবে।

প্রেশার সামান্য বাড়তে মনটা ককপিটে ফিরে এল রানার।

‘নামার সময় হয়েছে,’ বলল মিলি।

‘যতটা সম্ভব নিচ দিয়ে যাব আমরা,’ বলল রানা। ‘তীর থেকে

যথেষ্ট দূরে থাকো। আমি চাই একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে যেন মিশরীয় রাডারে ধরা না পড়ি।'

'ঠিক আছে।' চার্টের দিকে তাকাল মিলি। 'আমাদের বর্তমান কোর্সে, দামিয়েত্তার কাছে নাইল ডেলটায় পৌঁছুব আমরা, তিরিশ মাইল চওড়া এল মানজালা লেগুন পেরুব, খালে পৌঁছুব পোর্ট সাঈদকে যথেষ্ট দক্ষিণে রেখে, আল-বালাহর কাছাকাছি।'

রানা বলল, 'আমরা তীরের ওপর পৌঁছুনোর আগে পর্যন্ত যদি রাডারকে ফাঁকি দিতে পারি, মিশরীয়রা ভাববে প্লেনটা দেশের ভেতর কোথাও থেকে আকাশে উঠেছে। বাধা দেয়ার জন্যে ইন্টারসেপ্টর পাঠাতে মিনিট কয়েক দেরি করলেই হয়, নিরাপদে নেমে পড়ব আমরা।'

তবে এখনও মাটি বা জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, দিগন্তরেখার কাছে সেই একই দৃশ্য—কালো আকাশে মিটমিট করছে কিছু তারা, আকাশটা নেমে গেছে সাগরের শেষ প্রান্তে। জোড়া জিই টারবোজেট মৃদু গুঞ্জন করছে। শান্ত ভাব নিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে মিলির চোখ দুটো। নিজে প্লেন চালাতে জানে বলেই বুঝতে পারছে রানা, দক্ষ লোকের কাছে ট্রেনিং পেয়েছে মেয়েটা।

খানিক পর কন্ট্রোল কলাম ধরে টানল মিলি। সরল একটা পথ ধরে ছুটছে প্লেন। 'ফিফটি ফুট অলটিচ্যুড,' বলল সে। কথার সুরে খানিকটা উত্তেজনা।

'আর খানিকটা নিচে নামতে পারো না?'

'পাগল হয়েছ!' মিলির চোখ উইন্ডশীল্ডের দিকে।

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল রানা। 'নেভিগেশন লাইট নেভাও এবার।'

হাত বাড়িয়ে কন্ট্রোল কনসোল ছুঁলো মিলি।

‘অ্যান্টি-কলিশন বীকন আর রাডারও অফ করো,’ নির্দেশ দিল রানা।

‘রাডার? কি বলছ তুমি? ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল ছুটছি আমরা, মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে! রানা, নিচে পাওয়ার ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার আছে, রেডিও ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার আছে, এমনকি ওয়াটার টাওয়ার...’

‘আছে, খুব বেশি নয়,’ বলল রানা। ‘এলাকাটা সমতল, তোমার চিরকুমারী আন্টির বুকের মত।’

‘আমার কোন চিরকুমারী আন্টি নেই।’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইকুইপমেন্টগুলো অফ করল মিলি।

‘স্রেফ কথার কথা,’ বলল রানা।

‘তেমন যদি কেউ থাকতও, তার বুক অবশ্যই সমতল হত না।’

‘বিশ্বাস করলাম,’ বলল রানা। ‘ফুয়েলের কি অবস্থা?’

‘এরকম অলটিচ্যুডে খরচ তো বেশি হবেই, তবে প্রচুর আছে। আমাদের রেঞ্জ চার হাজার কিলোমিটার, তারপরও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রিজার্ভ আছে। কোস্টাস সব সময় ট্যাংক ভরে রাখে।’ মাথায় একটা ইয়ার-ফোন তুলল মিলি। ‘আমরা এখন পোর্ট সাঈদ রেডিও বীকন ভেদ করে যাচ্ছি।’

ডান দিকে নীল নদের মুখে দামিয়েত্তার আলো ঠিক যেন লাফ দিয়ে দিগন্তে উঁকি দিল। মাছ ধরার বোটগুলোর আলোগুলোকে সবেগে পিছিয়ে যেতে দেখল ওরা। এরপর দেখা গেল কালো কালো ছোপ, ব্যারিয়ার আইল্যান্ড। এল মানজালা লেগুনের ওপর উঠে এল প্লেন, খুব নিচ দিয়ে উড়ছে।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ঘড়িটার ওপর চোখ তুলল রানা। খুশি হলো মনে মনে। যে-টুকু সময় নষ্ট হয়েছিল, পুষিয়ে নিয়েছে মিলি।

কয়েক মুহূর্ত পর, রুট সেভেন-এর দীর্ঘ কজওয়েের ওপর চলে এল জেট, এল মাতারিয়া আর পোর্ট সাঈদের মাঝখানে।

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় মিলি বলল, 'পোর্ট সাঈদ টাওয়ার সাড়া দিতে বলছে। কি বলব ওদের?'

'কিছুই না।' আকাশে তল্লাশী চালাল রানা, চোয়াল শক্ত করে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট দরকার আমাদের।'

'ওরা পরিচয় জানাবার নির্দেশ দিচ্ছে।'

মাথা নাড়ল রানা, ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল।

চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে আছে মিলি, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে নিচের ঠোঁট। হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল সে। 'মাই গড!' পরমুহূর্তে কন্ট্রোল কলাম হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাছে টানল।

পলকের জন্যে সাদা আলোর আভা দেখতে পেল রানা, একটা জাহাজের মাস্তুলের মাথায় নেভিগেশন লাইট বলে চিনতে পারল। এত কাছে, আভাটুকু বিদ্যুৎচমকের মত দেখার পর কিছুক্ষণ লেগে থাকল চোখে।

নাক উঁচু করে প্লেনটা ওপরে উঠতে শুরু করেছে, একশো ফুট ওপর থেকে খালটাকে ফিতের মত লাগল দেখতে। উদ্বেগের সাথে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান আর গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইলের কথা মনে পড়ে গেল রানার, সিনাই-এ বসানো আছে সব, মাত্র কয়েক মাইল দূরে। 'ঘুরিয়ে নাও, প্লেন ঘুরিয়ে নাও! স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের কথা মনে নেই?'

'আমার হিসেবে খালটা এখানে থাকার কথা নয়,' বলল মিলি।

বৃত্ত রচনা করছে সে।

'বাইপাস যতক্ষণ দেখতে না পাও, দক্ষিণ দিকে এগোও,' বলল রানা। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে এক ঝাঁক সাদা-কালো-সাদা নেভিগেশন লাইট। নির্ঘাত নেমিসিস কনভয় হবে, ভাবল রানা।

'মিশরীয়রা আমাদের খুঁজছে,' বলল মিলি। 'পাগলামি শুরু করেছে রেডিও।'

'এত কম উঁচুতে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না, আর জাহাজগুলো রাডারের ছবি ঝাপসা করে দেবে।'

বাইপাসের ওপর দিয়ে ছুটল প্লেন। রুট ফোর-এর পাশে খাল ঘিরে থাকা চকচকে রেইল চিনতে পারল রানা, পানিপথের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে ওটা। কালো আকাশের গায়ে আবার চোখ তুলল ও, মিশরীয় ফাইটারের খোঁজে। দক্ষিণে জ্বলজ্বল করছে ইসমাইলিয়ার আলোকমালা। আর কিছু না হোক, ওরা অন্তত খামসিন বাতাসের আগে পৌঁচেছে।

এই সময় হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল শহর। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে বলে মনে হলো। তারমানে পাওয়ার লাইনে আঘাত হেনেছে খামসিন।

রানা উপলব্ধি করল, ভয়াবহ মরু ঝড় কাছে চলে এসেছে। 'ল্যান্ড করো,' মিলিকে নির্দেশ দিল ও।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মিলি, বৃত্ত রচনা করে নামিয়ে আনল প্লেন। হাইড্রলিক পাম্পের গুঞ্জন শোনা গেল, বিস্তৃত হলো ফ্ল্যাপস, নিচে ঝুলে পড়ল ল্যান্ডিং গিয়ার।

ওদের নিচে আলোকিত জাহাজের মিছিল, একের পর এক উত্তর দিকে ছুটছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে শক্তিশালী ল্যান্ডিং লাইট জ্বালল মিলি, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল একজোড়া আলো বিস্ফোরিত হলো সরু একটা হাইওয়ের ওপর, বালির মাঝখানে কালো আর চকচকে। রাস্তাটা ওদের দিকে উঠে এল ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে।

প্লেনটা হাইওয়ে বরাবর তাক করল মিলি, রানার তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল।

ঝাঁকি খেলো ওরা, নিরাপদে হাইওয়ের ওপর নামল লিয়ার জেট।

সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল মিলি। চোয়ালটা হাত দিয়ে ডলছে রানা, এত শক্ত হয়ে ছিল ওটা যে এখনও ব্যথা করছে।

কমপার্টমেন্টের দরজায় ডাচ জর্জের মুখ দেখা গেল, চোখে ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুক। 'বেঁচে আছি কিনা, কেউ আমাকে বলে দেবে?'

'নিজেকে চিমটি কাটো, দেখো রক্ত বেরোয় কিনা।' চরম উত্তেজনার মধ্যে মুহূর্তের বিরতি ঘটায় স্বস্তিবোধ করল রানা।

'জায়গাটা যদি মিশর হয়, একমাত্র বেলি ড্যান্সাররা আমাকে পুনর্জীবন দান করতে পারে।'

'তার আগে তোমাকে না আবার স্নেক ড্যান্সারদের খপ্পরে পড়তে হয়। নামো, তাড়াতাড়ি নামো,' তাগাদা দিল রানা।

প্লেনের পিছন দিকে চলে এল ওরা, প্যাক করা রাবার বোটটা লাথি মেরে হ্যাচ থেকে নিচে ফেলে দিল ডাচ জর্জ। উজিগুলো বহন করল রানা, ওর পিছু নিল মিলি, হাতে ক্লিপ।

নিস্তব্ধ, থমথমে রাত। নিঃসঙ্গ একটা ঝিঁঝি পোকা অনবরত ডাকছে। স্থির হয়ে আছে বাতাস।

'জাহাজগুলো বাইপাসে ঢুকছে,' ঘোষণা করল ডাচ জর্জ।

‘ভেলায় বাতাস ভরো।’

একটা কর্ড ধরে টান দিল ডাচ জর্জ। হিসহিস শব্দ তুলে ফুলে উঠল ভেলাটা।

‘অবলা নারী সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে?’ জানতে চাইল জর্জ।

‘অ্যাই, খবরদার।’ প্রতিবাদ জানাল মিলি। ‘মুখ সামলে কথা বলো!’

রানা বলল, ‘এখানেই থাকবে ও, প্লেনের সাথে।’

হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে টান টান হলো মিলি। এখনও হালকা স্ল্যাকস আর খাটো ব্লাউজ পরে আছে সে। স্থির হলেও, বাতাসে ঠাণ্ডা একটা ভাব রয়েছে। ‘কিন্তু, যদি কোন গাড়ি আসে?’ জানতে চাইল সে।

‘আসবে বলে মনে হয় না,’ বলল রানা, একটা উজি কাঁধে ঝোলাল। ‘আজকাল ইন্টারন্যাশনাল রুট চুয়াল্লিশ ধরেই প্রায় সব গাড়ি আসা-যাওয়া করে। সেটা এখান থেকে মাইল দুয়েক পশ্চিমে। তাছাড়া, খামসিনের ভয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় কোন গাড়ি থাকবে না।’

‘কিন্তু যদি…,’ শুরু করল মিলি।

‘টর্চ জ্বেলে প্লেনটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার ইঙ্গিত দেবে ড্রাইভারকে,’ পরামর্শ দিল রানা। ‘কেউ প্রশ্ন করলে বলবে, মেকানিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে হাইওয়ের ওপর ল্যান্ড করতে হয়েছে তোমাকে, সাহায্যের জন্যে লোক পাঠিয়েছ। ঠিক আছে?’

রাস্তার দু’দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল মিলি, কথা বলল না।

হাড়-কাঁপানো বিস্ফোরণের শব্দ হলো, মুখ তুলে বিপজ্জনক আকাশের দিকে তাকাল ওরা।

'মিগ,' বলল রানা, বেসুরো গলায়।

'আমাদেরকে খুঁজছে?' জর্জ হতভম্ব।

'কি মনে হয় তোমার?' রাবারের ভেলাটা খপ্ করে ধরল রানা। 'এসো, পানিতে নামাই এটাকে।'

বালির ঢাল থেকে পিছলে, হড়কে পানির কিনারায় নেমে এল ওরা। প্রথম জাহাজটাকে প্রকাণ্ড আকার নিয়ে ঝুলে থাকতে দেখল ওরা আকাশের গায়ে। কনভয় আসছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল জাহাজটা। পিছু পিছু আরেকটা এল। এভাবে একের পর এক। ছোট ঢেউগুলো ছুটে এসে গিলে ফেলছে বালিময় তীর। এঞ্জিন, পাম্প আর নানারকম যান্ত্রিক শব্দে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। ট্যাংকার, ট্রাম্প ফ্রেইটর, ক্রুজ শিপ, ইয়ট–সব রকম জাহাজই দেখা গেল।

রানা দেখে নিয়েছে, লাইনের তিন নম্বর জাহাজটা নেমিসিস। আগেই ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে সেটা, তবে জ্যোৎস্না ভরা আকাশের গায়ে জাহাজটার কাঠামো দেখা যাচ্ছে এখনও।

কনভয়ের প্রতিটি অংশ থেকে চেইন নাড়াচাড়ার শব্দের সাথে ভেসে এল পানিতে ঝপাৎ করে নোঙর ফেলার আওয়াজ।

ডাচ জর্জের দিকে ফিরল রানা, 'অ্যাংকর চেইন ধরে উঠতে পারবে?'

কাঁধে উজি ঝোলাল জর্জ। 'আমার ওপর ভরসা রাখো, ব্রাদার। কারও বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার জন্যে সব কিছু করতে পারি আমি।'

রানার বাহু স্পর্শ করল মিলি। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

'আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট।' শ্বাস টানল রানা। 'কনভয় চলে যাবার পরও যদি আমরা না ফিরি, একা কেটে পড়বে তুমি। পরে যদি কেউ তোমাকে জেরা করে, বলবে আমি তোমাকে জোর করে পুলিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, সুযোগ পেয়ে আমার কাছ থেকে পালিয়েছ তুমি। পরে আমার সম্পর্কে কিছুই তুমি শোনোনি।'

'এরকম ভান করা কঠিন হবে,' ম্লান সুরে বলল মিলি। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, প্লিজ, রানা।'

রাবারের ভেলাটা পানিতে ভাসিয়েছে ওরা, এই সময় আঘাত হানল খামসিন।

সাত

'আমরা শুধু প্যাসিমভ ভদ্রলোককে নিয়ে কেটে পড়ব,' বাতাস গর্জন করছে, চিৎকার করতে হলো রানাকে। হাত আর মুখ ঢাকা পড়ে গেছে বালিতে, কিচকিচ করছে মুখের ভেতরটা।

পাল্টা চিৎকার করল ডাচ জর্জ, 'এডওয়ার্ড গ্রীনকেও খুঁজে বের করতে হবে।'

'সে-ই কি প্যাসিমভকে জাহাজে তুলেছে?'

জর্জের জবাব শুনে মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি সে,

বা শুনতে না পাবার ভান করছে, 'যে-কোন ক্রু তার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের।'

নেমিসিসের বিরাট কাঠামো আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। পিছনে উঁচু বালির বাঁধ, জাহাজটাকে বিশাল একটা ইস্পাতের পর্দার মত লাগছে। নেমিসিসের কোল ছাড়িয়ে দূরে আর ওপরে চলে গেল রানার দৃষ্টি, ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট এক ঝাঁক তারা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

ফোক্যাসল থেকে পানি পর্যন্ত অ্যাংকর চেইনটা টান টান হয়ে রয়েছে।

'গ্রীন জাহাজে আছে কিনা কে জানে,' বলল রানা। 'থাকলে সম্ভবত বন্দী করে রাখা হয়েছে, তা না হলে ধরে নিতে হবে জাহাজটার অদৃশ্য হওয়ার সাথে তার সম্পর্ক ছিল।'

জর্জ কোন মন্তব্য করল না, এমনকি রানার দিকে তাকালও না সে।

অ্যাংকর চেইনের গায়ে ভেলা ভিড়াল রানা, চেইন ধরে উঠতে শুরু করল দ্রুত।

ভেলা থেকে চাপা কৌতুকের সাথে জর্জ বলল, 'আগে গেলে বাঘে খায়।'

ডেকটা প্রায় অন্ধকার। ব্রিজ আর চিমনি ধুলোর মেঘের ভেতর অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। যতদূর দেখতে পেল রানা, কেউ কোথাও নেই। বাতাসের গতি তীব্র হলেও, নেমিসিস মাটিতে পোঁতা রডের মত স্থির হয়ে রয়েছে। সাবধানের মার নেই, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানা। চারদিকে চোখ বোলাল।

রেইলিং টপকে ডেকে উঠে এল জর্জ, হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল। 'কি রকম বুঝছ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল

সে।

চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল রানা। রানার দেখাদেখি কাঁধ থেকে উজি নামাল জর্জ, ককিং লিভারে টান দিল, তারপর মাথা নিচু করে সতর্কতার সাথে ডেক ধরে রানার পিছু পিছু সামনে এগোল। এদিকটায় আলো এসেছে শুধু আপার ব্রিজের জানালা থেকে।

এগোবার সময় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল রানা, ডেকের এখানে-সেখানে রঙ যেন বদলে গেছে। একটা হাত প্রসারিত করে জর্জকে থামাল ও, পিছিয়ে এল কয়েক পা, পকেট থেকে বের করে পেন্সিল টর্চটা জ্বালল।

সরু আলোর টানেলে চিকচিক করে উঠল বালি। ডেকের ওপর হলুদ দাগ দেখল রানা। মনে হলো, কাদা। তারপর মনে পড়ল রানার, রোডস-এর কাছাকাছি সাগরের তলায় ব্যারেলের ভেতরও এই জিনিস দেখেছে ও। কাকতালীয় ব্যাপার, একই জিনিস দু'জায়গায়? বিস্মিত হয়েছে রানা। উঁহুঁ, কাকতালীয় হতে পারে না।

'কি হলো, রানা?' চাপা গলায় পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল জর্জ, অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয়ই নেমিসিসের ডেকে পড়ে গিয়েছিল ব্যারেলটা, ভেতরের পদার্থ খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে আসে, তারপর গড়াতে গড়াতে ডেক থেকে নেমে যায় সাগরে।

রানার পাশে চলে এল জর্জ। 'কি পেলে, সাত রাজার ধন?'

কথা না বলে সিধে হলো রানা, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। 'চলো,' বলল ও।

মাস্তুলের বাঁধনগুলো বাতাসের চাপে গোঙাচ্ছে। ডেক ধরে দ্রুত এগোল ওরা। বেরিয়ে থাকা বাল্কহেডে রাশি রাশি বালি

পড়ছে। হাতছানি দিয়ে জর্জকে তাড়াহুড়ো করার ইঙ্গিত দিল রানা, একটা ডেকহাউসে ঢোকার সাথে সাথে আকস্মিক নিস্তব্ধতা অনুভব করল ও। ইস্পাতের মই বেয়ে এক নম্বর হোল্ডে নামছে।

বাতাস গরম এখানে, ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। দেখতে দেখতে ঘেমে গেল ওরা। অলস ডিজেলের শব্দ পাচ্ছে রানা, শব্দের সাথে সামান্য কাঁপছে জাহাজটা। খোলের প্লেটে সগর্জনে আছাড় খাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। পেন্সিল টর্চের আলোয় ধুলো উড়তে দেখা গেল।

'খালি,' বলল রানা, জর্জের দিকে ঘুরল। 'রাশিয়ায় কি ধরনের কার্গো নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'স্পেয়ার অটো পার্টস। আমি নিজের চোখে লোড করতে দেখেছি।'

'আর ইটালিতে ফেরার পথে?'

'তা জানি না। বোধহয় খালি ফিরছিল।'

বালি ভরা মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে রানার। 'হোল্ড খালি থাকলে একটা শিপিং কোম্পানির লালবাতি জ্বলবে,' বলল রানা।

'তাহলে কার্গো কোথায়? প্রশ্নটা তোমার করা উচিত অ্যারোনাফিসকে, তাই না?'

'আংশিক উত্তর আমার বোধহয় জানা আছে,' বলল রানা।

'তাই?' জর্জের গলায় বিদ্রূপ।

'আমাদের অজানা কোন বন্দরে খালাস করা হয়েছে কার্গো, কিংবা অন্য কোন জাহাজে তোলা হয়েছে, সম্ভবত রোডস-এ বা রোডস-এর আশপাশে কোথাও—নেমিসিস হারিয়ে গেছে, এই খবরটা প্রচার করার পরে।' ধুলোর ভেতর শ্বাস নিল রানা। 'লগের অংশ ছিল জলপরী মেমো, জাহাজের ব্যবহার করা পথ গোপন

করার জন্যে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।’

‘কেউ বোধহয় এ-সব লক্ষও করেনি, কিংবা লক্ষ করলেও গুরুত্ব দেয়নি,’ বলল জর্জ। ‘আমরা শুধু জানি একজন রুশ ভি.আই.পি. বিনা ভাড়ায় জাহাজটায় আত্মগোপন করে আছেন। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, কোস্টাস অ্যারোনাফিসকে ভুগতে হবে–তাকে, বা প্রতারণার জন্যে দায়ী লোকটাকে।’

‘এসো, পরের হোল্ডটা পরীক্ষা করি।’

আরেকটা বাল্কহেডের দিকে এগোল রানা। সব কিছুর ওপর ধুলো জমে আছে, কপাল থেকে ঝরে পড়া ঘাম তার ওপর কালো ফোঁটা তৈরি করল। দু’নম্বর হোল্ডে নেমে পেন্সিল টর্চ জ্বালল রানা, ডেক খালি দেখে হতাশ হলো ও।

মুখের সামনে মুঠো করা হাতে নিঃশ্বাস ছাড়ল জর্জ, বাইরে গর্জন করছে বাতাস। ‘এটাও দেখছি খালি,’ মন্তব্য করল সে।

‘মনে হয় না, দাঁড়াও দেখি,’ বলে হোল্ডের শেষ মাথা লক্ষ্য করে আলো ফেলল রানা।

দু’জনেই চোখ কুঁচকে তাকাল, চোখের সামনে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাসের সাথে বালি উড়ছে। স্তূপ করা ক্যানভাস-এর মত কি যেন পড়ে রয়েছে কোণটায়, ঠিক চিনতে পারা গেল না।

সাবধানে এগোল রানা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওর পিছু নিল জর্জ।

কাছাকাছি এসে থামল ওরা। বড় আকৃতির কয়েকটা ব্যাগ ওগুলো। রাবারের তৈরি। এ-ধরনের ব্যাগে সাধারণত লাশ ভরা হয়, জানে রানা।

অমঙ্গল আশংকা করে রানার আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,

স্তূপের প্রথম ব্যাগটার বাঁধন খুলতে অস্বাভাবিক বেশি সময় নিল ও। রক্ত, বমি আর প্রস্রাবের গন্ধ ঢুকল ওর নাকে। অ্যাসাইনমেন্টের দফা রফা হয়ে গেছে, খালি হাতে ফিরে যেতে হবে ওকে? ব্যাগের ভেতর সত্যিই কি নিকোলাই প্যাসিমভের লাশ দেখতে পাবে ও?

বাঁধন খুলে ব্যাগের মুখটা বড় করল রানা। টর্চের আলোয় একটা মুখ দেখা গেল।

'না তো!' রানার পাশ থেকে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল জর্জ। 'এটা রুশ বিজ্ঞানীর লাশ নয়!'

'গ্রীনের?'

'না।' সরু গোঁফের ওপর নাক টানল জর্জ, দামী জাম্পসুটের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

বাকি ব্যাগগুলোয় কি আছে কে জানে। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে রানার। দ্বিতীয় ব্যাগটা খুলতে বেশি সময় নিল না। আরও কম সময় লাগল শেষ ব্যাগটা খুলতে। ইতিমধ্যে দুর্গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস।

সব মিলিয়ে তিনটে লাশ। প্রত্যেকের সাথে মেরিটাইম অফিসারের প্রতীক চিহ্ন রয়েছে। একজনের ফিতে দেখে গ্রীক মার্চেন্ট মেরিনের ক্যাপটেন বলে চেনা গেল।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল লাশগুলোর দিকে। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, হোল্ডের ভেতর নিস্তব্ধতা আর দুর্গন্ধ। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে নিউজপ্রিন্ট হয়ে গেছে ওর। জর্জের দিকে তাকাল না ও, মুখ থেকে কথা সরছে না।

বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রয়েছে রানা। ব্যাপারটা এখন আর সাধারণ একটা কমার্শিয়াল জাহাজে

বেআইনী অনুপ্রবেশ নয়, জাহাজের নাবিক আর ক্রুদের নিরীহ ও গোবেচারা মনে করার কোন কারণ নেই। জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতেই থাক, পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। প্রয়োজনে আরও খুন করতে ইতস্তত করবে না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ডাচ জর্জ, 'মিউটিনি, তোমার ধারণা?'

'হতে পারে। পাইরেসিও হতে পারে।'

'আমার ধারণা, ওরা বাধা দিয়েছিল,' ইঙ্গিতে লাশগুলো দেখিয়ে বলল জর্জ।

'ব্যাগে লাশগুলো খুনিরাই ভরেছে, ভেবেছে গালফ অভ সুয়েজে পৌঁছে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দেবে। খালে লাশ ফেলা মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার।'

'পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে না ভদ্রলোক ভাল অবস্থায় আছেন। এখানে তাঁর লাশ নেই...'

'তারমানে এই নয় যে তিনি বেঁচে আছেন,' বলল রানা। 'দেখতে হবে।'

'তাঁকে হয়তো কিডন্যাপ করা হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল জর্জ।

একটা হ্যাচের দিকে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলল রানা। শব্দ শুনে আন্দাজ করল, এঞ্জিন রূমটা হ্যাচের আরেক দিকে হবে। 'এখানে আর কিছু দেখার নেই আমাদের,' বলল ও। 'এসো।'

হ্যাচের হাতল ঘুরিয়ে টান দিল রানা। হাত টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরল উজিটা। উত্তপ্ত লুব্রিকেটিং তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে, সেই সাথে এঞ্জিন রূমের এক ফালি আলো পড়ল পায়ের কাছে। সতর্কতার সাথে খোলা মুখটা দিয়ে উঁকি দিল ও, পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে আনল মাথাটা।

তিনজন ক্রুকে দেখতে পেয়েছে রানা। গজ রিডিঙে ব্যস্ত একজন, বাকি দু'জন তেল ঢালছে আর ন্যাকড়া দিয়ে এটা-সেটা মুছছে।

সতর্কতার সাথে আবার একবার উঁকি দিল রানা।

ক্রুদের মাথার ওপর, গ্রিল লাগানো মেঝে সহ ক্যাটওয়াক, খোলের একটা পাশ ধরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়েছে সেটা। ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও একজন লোক, নিচের লোকগুলোর ওপর নজর রাখছে সে। হাতে ঝুলছে ভারি অটোমেটিক পিস্তল। চ্যাপ্টা মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, ক্রুদের পাহারা দিচ্ছে সে।

পিছিয়ে এল রানা, জর্জের কানে ফিসফিস করল, 'এঞ্জিন রূমে যাচ্ছি আমি। তুমিও আসছ, তবে পিছন দিকে একটা চোখ রেখো।'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'ঠিক আছে।'

ঊরুর ওপর হাতের তালু ঘষল রানা, তারপর দরজা পেরিয়ে এঞ্জিন রূমে ঢুকল।

চ্যাপ্টা মুখে হতচকিত একটা ভাব ফুটে উঠল, নীল চোখে রাজ্যের বিস্ময়, ক্যাটওয়াক থেকে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। লোকটার মাথায় সীম্যান'স ক্যাপ একদিকে কাত হয়ে আছে। হাঁ করা মুখে বাতাস ঢুকছে সশব্দে।

'নোড়ো না,' গ্রীক ভাষায় নির্দেশ দিল রানা, ঝড় আর এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার, হাতের উজিটা লোকটার দিকে তাক করা।

চ্যাপ্টা মুখ থেকে কর্কশ একটা শব্দ বেরোল, হাতের পিস্তলটা উঠে এল রেইলিঙের ওপর। গুলি না করে উপায় থাকল না রানার।

গর্জে উঠল সাবমেশিন গান।

বুলেট ছিনিয়ে নিল মাথার ক্যাপ, লোকটার পা দুটো হঠাৎ এমনভাবে ভাঁজ হয়ে গেল যেন পিচ্ছিল বরফে পিছলে গেছে। গ্রিলের ফাঁক গলে ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল, ছিটকে পড়ল চারদিকে।

তিনজন ক্রুর দিকে তাকাতে যাবে রানা, শুনতে পেল ক্যাটওয়াকে পড়ে থাকা লোকটা কথা বলছে। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে, শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করল রানা।

লোকটা বলে উঠল, 'কে...!' রুশ ভাষায়।

রানার আগেই নেমিসিসে পৌঁছে গেছে কে.জি.বি।

ক্রু তিনজন কোন শব্দ করছে না। বড় বড় মেশিনের আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে তারা। দরজা টপকে এঞ্জিন রূমে ঢুকল ডাচ জর্জ, ক্যাটওয়াকে পড়ে থাকা লাশটা দেখল, চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

গ্রীক ভাষায় প্রশ্ন করল রানা, 'এডওয়ার্ড গ্রীন নামে একজন ক্রু আছে, কোথায় সে?'

বিশাল ছাতি নিয়ে একজন ক্রু আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে এল। 'জাহাজে সে নেই, স্যার?'

'নেই কেন? কি হয়েছে তার?'

'জাহাজ থেকে পালিয়েছে। বুদ্ধিমান লোক।'

'কোথায়? জাহাজ তখন কোথায় ছিল?'

তিনজন ক্রু নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল, চাপা কণ্ঠে। কিছুই শুনতে পেল না রানা। অবশেষে প্রথম লোকটা বলল, 'রোডসে, স্যার। আপনাকে আমরা বলে দিয়েছি, সেকথা কেউ

যেন না জানে, প্লিজ। আমাদেরকে শপথ করানো হয়েছে, রোডস নামটা পর্যন্ত মুখে আনতে পারব না। স্যার, আপনি কি এই অভিশপ্ত জাহাজ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন?'

রানা আর জর্জ নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল। দু'জনেই হতাশ।

লোকগুলোর দিকে ফিরল জর্জ, ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'নিকোলাই প্যাসিমভের কি হয়েছে?'

'কার?'

'বয়স্ক এক ভদ্রলোক ছিলেন জাহাজে, নিকোলাই প্যাসিমভ। গ্রীন তাঁর দেখাশোনা করত।'

'ও, আচ্ছা, তাঁর কথা বলছেন!' চওড়া বুকে হাত বোলাল লোকটা। ওপর দিকে একটা আঙুল খাড়া করল সে, চাপা কণ্ঠে বলল, 'ব্রিজে, স্যার। তাঁকে আমরা শেষবার দেখেছি অফিসার্স কোয়ার্টারে।'

'ভদ্রলোক এখনও জাহাজে আছেন,' বিড় বিড় করে বলল রানা, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আশ্চর্য, গ্রীন তাঁকে একা ফেলে রেখে পালিয়েছে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল জর্জ। 'গ্রীন সেরকম লোকই নয়।'

'এইচআরসি-র লোকদের আমার চেনা আছে,' বলল রানা। 'প্রতিটি কাজ লেজেগোবরে করতে ওদের জুড়ি নেই।' হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করল ও, চোখ তুলে তাকাল ওপর দিকে, কি যেন শুনতে পাবে বলে আশা করছে।

অস্পষ্ট শব্দটা এল খানিক পর। ঝড়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

লম্বা একজন ক্রু, মাথায় টাক, তিনজনের মধ্যে সেই এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি, হঠাৎ কমপার্টমেন্টের দরজা লক্ষ্য করে

ছুটল। দরজাটা রানার বাম দিকে। ‘এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকছি না!’ বলল সে, হ্যাচ গলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পরমুহূর্তে একটা চিৎকার শোনা গেল, শব্দ হলো এক ঝাঁক বুলেট বর্ষণের, হ্যাচের বাইরে থেকে ছিটকে এঞ্জিন রূমে ফেরত এল লোকটা, সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

আট

দু’নম্বর হোল্ডের দরজা লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল ডাচ জর্জ, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির সাথে ধাক্কা খেলো, রক্তচক্ষু মেলে তাকাল নাবিকের দিকে, খেঁকিয়ে উঠল, ‘যেতে দাও আমাকে, পথ ছাড়ো!’

দ্বিতীয় নাবিক ডেকের ওপর শুয়ে পড়েছে।

স্থির, শান্তভাবে অপেক্ষা করছে রানা। মোটর হাউজিঙ-এর দিকে তাক করা রয়েছে হাতের উজি।

ছুটে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল এক লোক, ঝাপসা হ্যাচওয়ে লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি করল রানা। চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল, পতন আর গড়ানোর শব্দ হলো, কে.জি.বি. এজেন্টের লাশের ওপর পড়ল একটা কালাশনিকভ অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল, পিছু পিছু পড়ল রাইফেলের নিহত মালিকও।

ধুলোর সাথে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বারুদের গন্ধ। উল্টোদিকের হ্যাচ লক্ষ্য করে ছুটল রানা।

অন্ধকার হোল্ডে ফিরে আসবার পর উৎকট গন্ধটা রানাকে মনে করিয়ে দিল, লাশগুলো পচতে শুরু করেছে। প্রকাণ্ডদেহী নাবিকের সাথে হোল্ডের শেষ মাথায় খোলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে ডাচ জর্জ, অস্পষ্টভাবে তাদের দেখতে পেল ও।

কাছাকাছি এসে নাবিকের উদ্দেশে কর্কশ গলায় বলল রানা, 'অফিসার্স কোয়ার্টার কোন্ দিকে?'

একটা হাত তুলে ঘন ঘন নাড়ল নাবিক। 'আমাকে মাফ করতে হবে, স্যার!'

লোকটার পেটে উজির মাজল চেপে ধরল রানা। আর্তনাদ করে উঠল সে।

'তুমি কি পাগল হলে?' অস্থির দেখাচ্ছে জর্জকে, ঘামে চকচক করছে কপাল। 'অফিসার্স কোয়ার্টারে খুন হবার জন্যে যেতে চাইছ? জাহাজটাকে শত্রুরা ঘাঁটি বানিয়ে রেখেছে...'

'শান্ত হও,' ধমক দিল রানা।

'এখানে থাকলে আমরা বাঁচব? আমাদের কোন আশা আছে?' পাল্টা চিৎকার করল জর্জ।

'বেরুতে হলেও যুদ্ধ করে পথ করে নিতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম, বিপদ হতে পারে।'

নাবিকের দিকে তাকাল জর্জ। 'কি বলল তুমি শুনেছ। অফিসার্স কোয়ার্টার। পথ দেখাও!' সিধে হয়ে দাঁড়াল সে।

আপার ডেকে ছায়ার ওপর ছায়া পড়ে জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেছে। বাতাসতাড়িত ধুলোয় সব কিছু ঝাপসা আর অস্পষ্ট। একটা ডেকহাউসের পাশে পৌঁছে আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা, হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করল খালের

পাড় থেকে ভেলা নিয়ে রওনা হবার পর পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। আরও কতক্ষণ স্থির থাকবে কনভয়, ওর জানা নেই। মিলির কথা মনে পড়ল, অন্ধকার হাইওয়েতে ওদের ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছে একা। মেয়েটা না আবার নার্ভাস হয়ে পড়ে।

'ওই, ওপরে!' আপার ব্রিজের পোর্টহোলের দিকে একটা হাত তুলল গ্রীক নাবিক। ম্লান আলো দেখা গেল সেদিকে।

ঝাপটা দিয়ে তার হাতটা নামাল রানা, চারজন লোকের একটা দলের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। ভৌতিক ছায়ার মত এগিয়ে আসছে তারা, একজনের পিছনে একজন, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। রেইল ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা।

রানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দলটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল ডাচ জর্জ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, খুব বেশি হলে পনেরো গজ দূরে, ধুলো আর বাতাসের ভেতর স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো, বুলেটের ধাক্কায় রেইল টপকে খালের পানিতে পড়েছে লাশগুলো।

ওদের গোপন অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে। রাগের সাথে নির্দেশ দিল রানা, 'ব্রিজের দিকে ছোটো!'

'এখনও সময় আছে, রানা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জর্জ। 'বাঁচতে চাইলে চলো পালাই...'

কষে একটা চড় মারল রানা জর্জের গালে। 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে?' আবার চড় তুলে গর্জে উঠল চাপা গলায়, 'হাঁটো!'

ভিজে বেড়ালের মত এগোল জর্জ।

ব্রিজের সুপারস্ট্রাকচার কালো পাহাড়-প্রাচীরের মত উঁচু হলো ওদের সামনে।

‘গুলি করার আগে আমার অনুমতি নেবে,’ বলল রানা।

ও থামতেই, ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল। পিছন থেকে এল আওয়াজটা। গুঙিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ল গ্রীক নাবিক। আঁচড়াআঁচড়ি করে একটা মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। মুহূর্তের জন্যে থামল, উজিটা ঘুরিয়ে বিস্ফোরণের উৎস লক্ষ্য করে ফায়ার করল। রানার উজি থামতেই গর্জে উঠল জর্জের উজি।

অকস্মাৎ ফ্লাডলাইটের আলোয় দিনের মত পরিষ্কার হয়ে উঠল গোটা জাহাজ।

হলদেটে ধূলিঝড়ে ঝাপসা হয়ে আছে আফটারডেক। চারদিকে আলোর বন্যা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একদল রাশিয়ান এজেন্ট, সংখ্যা দশ-বারোজনের কম নয়, ব্যগ্রতার সাথে এদিক ওদিক ঘন ঘন তাকিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজছে। সবার হাতে অটোমেটিক এ/কে অ্যাসল্ট রাইফেল, সামনের উঁচু করা সাইট আর ম্যাগাজিন ক্লিপ দেখে চিনতে পারল রানা। দলটার আরও পিছনে, উঁচু মঞ্চের ওপর, আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের রাইফেল রানার দিকে তাক করা, লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে, সেই সাথে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে কি যেন বলছে চিৎকার করে।

চারদিকে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো।

বেঢপ একটা আকৃতি নিয়ে করিডরে খসে পড়ল রানা। এক সেকেন্ড পরে পড়ল জর্জ, তার হাত থেকে ছিটকে দূরে সরে গেছে উজিটা।

তাড়াতাড়ি সিধে হলো দু’জন। দড়াম করে কম্প্যানিয়নওয়ের হ্যাচটা বন্ধ করে দিল রানা, প্রতিটি স্টেটরূমের দরজায় সজোরে

ঘুসি মারল, নিকোলাই প্যাসিমভের নাম ধরে ডাকল।

করিডরের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসার পর একটা স্টেটরূমেই পাওয়া গেল তাঁকে।

ফটোতে দেখা চেহারার সাথে সামান্যই মিল খুঁজে পেল রানা। বয়স পঞ্চাশ, কপালটা উঁচু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোয়াল, চেহারায় ক্লান্তি। চোখ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে, ঝাপসা সবুজ মণি। ক্লান্তি তাঁর চেহারা থেকে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলতে পারেনি। ধ্যানমগ্ন শান্ত একটা ভাব লক্ষ করল রানা, যা শুধু আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা একজন মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ভদ্রলোক যে সাধারণ কেউ নন, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। সার্জ-এর একটা স্ল্যাকস পরে আছেন তিনি, গায়ে সুতো বেরিয়ে আসা টুইড জ্যাকেট, ঢোলা, কম্বলের মত জড়িয়ে রেখেছে তাঁকে। দর দর করে ঘামছেন তিনি।

'কে তোমরা? কি চাও?' রুশ ভাষায় জানতে চাইলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। রানার মনে হলো, তিনি যেন কারও আসার অপেক্ষায় সজাগ ছিলেন।

'আমাদের সাথে আসুন,' দ্রুত বলল রানা, সবিনয়ে। 'প্লিজ।'

'না!'

'আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি,' বলল রানা। 'এখানে থাকলে আপনার বিপদ হবে। আপনাকে যারা সাহায্য করছে, এইচ-আরসি, আমরা...'

'না! তোমাদের আমি চিনি না...'

কথা না বলে রানাকে পাশ কাটাল ডাচ জর্জ, নিকোলাই প্যাসিমভের একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল। তাঁকে টেনে রানার দিকে নিয়ে আসছে সে। ধস্তাধস্তি শুরু করলেন রুশ

বিজ্ঞানী, তাঁর পা দুটো ধুলো ঢাকা ডেকে ঘষা খাচ্ছে। 'কি ব্যাপার, নিজের কিসে ভাল বুঝতে পারছেন না?' ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'বুঝতে তোমরা পারছ না!' ইংরেজিতে জবাব দিলেন নিকোলাই প্যাসিমভ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। 'সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিরে যেতে চাই আমি!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। জর্জের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'আপনি বোধহয় ভয় পাচ্ছেন, আমরা আপনার ক্ষতি করতে পারি,' বলল জর্জ। 'আসলে আমরা আপনার বন্ধু...'

'কথার সুরেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি আমেরিকান,' নিকোলাই প্যাসিমভ বললেন।

'তাতে কি হলো? এইচআরসি-তে আমার মত আরও অনেক আমেরিকান আছে। আমাদেরকে পাঠানোই হয়েছে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে...'

'জানি, জানি,' নিকোলাই প্যাসিমভ গম্ভীর হলেন। 'তোমরা আমাকে চাও। আমাকে তোমাদের দরকার।'

'চিন্তা করবেন না, মি. প্যাসিমভ,' বলল রানা। 'আপনি যদি আমেরিকায় যেতে না চান, কেউ আপনাকে সেখানে জোর করে পাঠাবে না। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি আমাদের সাথে নিরাপদে থাকবেন।'

'আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন না আপনারা,' একাধারে ধমক ও অভিযোগের সুরে বললেন প্যাসিমভ। 'আমি সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বস্ত নাগরিক। আমার দেশকে আমি ভালবাসি। আমেরিকা বা অন্য কোন দেশ যদি ভেবে থাকে আমার সাহায্য

নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার অনিষ্ট করবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে।'

হতভম্ব হয়ে গেল জর্জ। 'এ-সব আপনি কি বলছেন!'

রানা চাপা গলায় বলল, 'আলোচনা করার সময় নেই!' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দিকে তাকাল চট করে। 'কম্প্যানিয়নওয়ে হ্যাচ দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওরা।'

রানার কথা কানে তুললেন না রুশ বিজ্ঞানী। 'আমেরিকানরা আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, আমার জ্ঞান আর আবিষ্কারগুলো আমার দেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইবে, তাই না?' আমেরিকান ডাচ জর্জের দিকে ফিরে কথা বলছেন তিনি। 'আমি একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, কিছুদিন আগে আমার দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা গবেষণার সাথে জড়িত ছিলাম...অবশ্য এ-সবই তোমাদের জানা থাকার কথা।'

'মার্কিন সরকারের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই,' বলল জর্জ। 'আমি এইচআরসি-র...'

'কিন্তু তবু তুমি একজন আমেরিকান।' রানার দিকে ফিরলেন নিকোলাই প্যাসিমভ। 'আর তুমি? তুমি কে?'

নিজের পরিচয় দিল রানা, সত্যি কথাই বলল। 'আমি একজন এজেন্ট, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এ আছি। রাশিয়ার সাথে কোন ব্যাপারেই আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। আমার এখানে উপস্থিত থাকার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আপনি শুধু রাশিয়ার গর্ব নন, গোটা দুনিয়ার গর্ব। আপনার কিছু হলে সবাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। তাই...'

হঠাৎ বিষণ্ন হাসি ফুটল নিকোলাই প্যাসিমভের ঠোঁটে।

‘বাংলাদেশ, তাই না? দরিদ্রস্য দরিদ্র, যদি কিছু মনে না করো। তোমাদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়! বর্তমান দুনিয়ায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হচ্ছে না বলেই আজ তোমরা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছ। আমার ফর্মুলা অনুসারে পারমাণবিক শক্তি শুধু যদি শান্তির কাজে ব্যবহার শুরু হয়, বিশ্বাস করো, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোর চেহারা রাতারাতি বদলে যাবে...’

‘আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা। ‘কিন্তু আপনার কথা পরে শুনব। আমরা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছি, মি. প্যাসিমভ। এখুনি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারি, ওরা আমাদেরকে...’

‘বেরিয়ে যাব? বেরিয়ে কোথায় যাব?’

রাগ চেপে রানা বলল, ‘বললাম না, আমরা আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখব? আমাদের সাথে আপনি...’

রানাকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। ‘বাংলাদেশী একজন এজেন্টকে কেন আমি বিশ্বাস করব? তুমি যে আমেরিকানদের চর নও, কি করে বুঝব আমি? বাংলাদেশ আমেরিকান এইড পায়, কি করে বুঝব তাদের ইন্টেলিজেন্স সি.আই.এ-কে সাহায্য করছে না?’

জবাবে রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিলেন নিকোলাই প্যাসিমভ।

গম্ভীর হাসির সাথে তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি, আমেরিকানদের কখনোই তা জানাব না, তবে জানার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তারা, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত তারা, জানতে না পারলেও রটিয়ে দেবে যে

জেনেছে–সাইকোলজিক্যাল সুবিধে আদায়ের উদ্দেশে। কোন না কোনভাবে তারা আমাকে ব্যবহার করবে, যাতে আমার দেশের নেতারা বিশ্বাস করেন যে কোন রহস্যই আর গোপন নেই।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা, বলল, 'তাহলে আপনি রাশিয়া থেকে বেরুলেন কেন? নিশ্চয়ই আবার ফিরে যাবার জন্যে নয়? সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন হঠাৎ করে, কারণটা কি বলুন তো?'

ক্লান্তি আর হতাশা ফুটে উঠল রুশ বিজ্ঞানীর চেহারায়, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এভাবে রক্ত ঝরবে, এত মানুষ মারা যাবে, দুঃস্বপ্নেও আমি তা ভাবিনি। ভাবিনি আমেরিকানরা আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে। আমি শান্তির সপক্ষে সারা দুনিয়ায় একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম মাত্র, দেশের সাথে বেঈমানী করতে রাজি নই।'

'ফিরবেন কিনা, সেটা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত,' জর্জ বলল। 'কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, ফেরার পর কি ঘটবে? কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে, অবৈধভাবে দেশত্যাগ করেছেন আপনি, আপনাকে গ্রেফতার করা হবে না তো? আপনি যদি অন্য কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন, সেখান থেকে অন্তত আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে দুনিয়ার মানুষ।'

'একজন বেঈমানের কণ্ঠস্বর হবে সেটা,' প্যাসিমভ বললেন, 'আমি যদি আমেরিকায় আশ্রয় নিই।'

গলায় আবেদন ফুটিয়ে জর্জ বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো বলছি, আমি এইচআরসি-র লোক। আপনার রাশিয়ায় ফেরার বা আমেরিকায় যাবার কোন দরকার নেই। যেখানে যেতে চান সেখানেই আমরা আপনাকে পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি।'

'আমি জোর করার পক্ষপাতি নই,' বলল রানা। 'উনি যদি

রাশিয়ায় ফিরতে চান, আমি বাধা দেব না।' মনে মনে ভাবছে ও, ভদ্রলোক না শেষ পর্যন্ত স্বদেশীদের হাতে খুন হয়ে যান।

'আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন দেশে যেতে পারলে মন্দ হত না,' প্যাসিমভ সখেদে বললেন। 'কিন্তু অন্য কোন দেশে নিয়ে যাবার কথা বলে আমাকে যে আমেরিকাতেই নিয়ে যাওয়া হবে না, তা বুঝব কিভাবে? না, এত বড় ঝুঁকি আমি নিতে রাজি নই।'

সঁ্যাৎ করে প্যাসিমভের দিকে সরে এল রানা, তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সুপারস্ট্রাকচারের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে পায়ের ও গলার আওয়াজ ভেসে এল। রাশিয়ানরা সম্ভবত ওদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। এই মুহূর্তে ওর করণীয় কি?

রুশ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েত সরকার প্যাসিমভের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে, রানা জানে না। তবে যার নেতৃত্বে কে.জি.বি-র এজেন্টরা প্যাসিমভ সমস্যা সমাধান করতে এসেছে তাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না ও। রুস্তমভ বা তার এজেন্টরা যে নিকোলাই প্যাসিমভকে দেখামাত্র গুলি করবে না, তার নিশ্চয়তা কি? তারা তো আর জানে না যে প্যাসিমভ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন?

কাজেই নিকোলাই প্যাসিমভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়া দরকার।

ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, 'বাধা দেবেন না, প্লিজ, মি. প্যাসিমভ। আপাতত আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন। কথা দিচ্ছি, যেখানে চাইবেন সেখানেই আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে।'

দ্রুত পায়ে আউটার বাল্কহেডের দিকে এগোল রানা, চৌকো একটা পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। বেশির ভাগ

ফ্রেইটার লাইফবোট বহন করে ব্রিজের ওপর, জানে ও। নেমিসিসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। জানালার ঠিক নিচেই ক্যানভাসে ঢাকা একটা লাইফবোটের বো দেখা গেল, নিজস্ব ডেভিট থেকে ঝুলছে।

স্টেটরূমের দোরগোড়ায় ফিরে এসে জর্জকে বলল রানা, 'পোর্টহোল দিয়ে বের করো ওঁকে, লাইফবোটে তোলো। আমি তোমাদের কাভার দেব।'

রাগের সাথে প্রতিবাদ জানাল জর্জ। 'লাইফবোট আমরা নামাব কিভাবে? কিভাবে নামাতে হয় তাই আমি জানি না। আর বাইরে যে লোক রয়েছে তার কি হবে?'

করিডরের শেষ মাথায় কম্প্যানিয়নওয়ের দরজা অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল। স্যাঁৎ করে স্টেটরূমের ভেতরে সরে এল রানা, ছেড়ে আসা জায়গা দিয়ে ছুটে গেল উত্তপ্ত এক ঝাঁক সীসা। রানার হাতের উজি পাল্টা জবাব দিল, সেই সাথে জর্জের উদ্দেশে চিৎকার করল ও, 'বোট নিয়ে ভাসতে হবে না। ওটাকে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করো। ওখান থেকে লাফ দিলে পানিতে পড়বে খোল থেকে নিরাপদ দূরত্বে।'

স্টেটরূমের বাইরে উঁকি দিয়ে আবার এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল ও, ভেতরে টেনে নিল মাথাটা।

সাথে সাথে পাল্টা জবাব দিল প্রতিপক্ষ।

তবে, এগোতে সাহস পাচ্ছে না তারা, এমনকি হলওয়ের দরজাটাও কেউ পেরুতে চেষ্টা করছে না।

শব্দ শুনে রানা বুঝল, পোর্টহোলটা খুলতে পেরেছে জর্জ। স্টেটরূমের ভেতরটা বালি আর ধুলোয় ভরে গেল।

স্টেটরূমের পিছন দিকে, দ্বিতীয় দোরগোড়া থেকে উঁকি

দেয়ার জন্যে ছুটল রানা, করিডরের উল্টোদিকের প্রান্তে সিঁড়ির একটা ল্যান্ডিং রয়েছে ওদিকে। কাউকে দেখল না রানা, তবু এক ঝাঁক গুলি করে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষদের সাবধান করে দিল ও, এদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে বাধা পেতে হবে।

প্রথম দোরগোড়ায় রানার অনুপস্থিতি টের পেয়ে করিডরে বেরিয়ে এল প্রতিপক্ষরা, তাদের ছুটন্ত বুট জুতোর শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করে আবার গুলি করল রানা, হিপ পকেট থেকে স্পেয়ার বের করে খালি ক্লিপের জায়গায় ভরল, উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল ধুলোয় ঝাপসা পোর্টহোলের দিকে।

কাউকে দেখল না। প্যাসিমভকে নিয়ে চলে গেছে জর্জ।

অন্তত পাঁচ মিনিট প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখার ইচ্ছে ওর। হাবভাব দেখে ধরে নিয়েছে, সরাসরি স্টেটরুমে ঢুকে পড়ার চেষ্টা তারা করবে না। তাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তারা। প্রাণ বিসর্জন না দিয়েও ওকে তারা ধরতে বা খুন করতে পারবে, সময়ের ব্যাপার মাত্র।

থেমে থেমে গুলি করছে কে.জি.বি. এজেন্টরা। শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে, তারা সরে যায়নি।

বাইরে সগর্জনে বয়ে যাচ্ছে খামসিন।

ধুলোর ভারি মেঘ ধাতব খোলের গায়ে সশব্দে ঝাপটা মারছে।

রানার গলা থেকে শুকনো কাশি বেরোল, ঘাম মুছল চোখ থেকে, হাতঘড়ি দেখল।

প্যাসিমভকে নিয়ে জর্জ কোন বিপদে পড়ল কিনা কে জানে। পোর্টহোল দিয়ে একবার উঁকি দিতে পারলে ভাল হত।

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। পাঁচ মিনিট এত লম্বা হয়!

কম্প্যানিয়নওয়ের দিক থেকে আবার এক পশলা গুলি হলো।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছেন প্যাসিমভ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হবে, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শক্ত করল রানা, দোরগোড়া থেকে উজির নল বের করে প্রায় সম্পূর্ণ ক্লিপ খালি করে ফেলল, গুলি ছুঁড়ল কম্প্যানিয়নওয়ের দু'দিকেই। ধুলোয় ভরা বাতাসে ধোঁয়ার রেখা দেখা গেল। হাতের উজি ফেলে স্টেটরুমের ওপর দিয়ে দৌড় দিল রানা, যেন তাড়া করেছে ভূত।

ভয়ানক ব্যস্ততার সাথে জানালা থেকে লাফ দিয়ে লাইফবোটে নামল ও। কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান দিল খামসিন, খামচি দিল চোখে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল লাইফবোট থেকে। নিচে তাকিয়ে কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না রানা।

লাফ দিয়ে শূন্যে পড়তে যাবে, কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ও।

লাফ দেয়ার পরও প্রায় মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট।

ছলকে উঠে রানাকে গ্রহণ করল খালের পানি, গ্রাস করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত ডুব সাঁতার দিল রানা। দিক্‌ভ্রান্ত হলো কিনা দেখার জন্যে মাথা তুলল পানির ওপর।

ছুটোছুটি, চিৎকার, ধমক আর নির্দেশের শব্দ ভেসে এল নেমিসিস থেকে। খালের অন্ধকার পানিতে একটা সার্চলাইটের আলো চঞ্চল হয়ে উঠল, তবে ইতিমধ্যে খালের কিনারায় ঢালটা পেয়ে গেছে রানা। উঠে এল ও, ঝর ঝর করে পানি ঝরছে গা থেকে।

ছুটছে রানা, এরইমধ্যে কাপড়চোপড় আর গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে বালি। লম্বা পায়ে ছুটছে ও, অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। দূরে

কোন আলোর চিহ্ন নেই, তারমানে ইলেকট্রিসিটি এখনও ফিরে আসেনি। আসার কথাও নয়। পথটা চিনতে অবশ্য কোন অসুবিধে হলো না। আধমাইল দূরে রয়েছে লিয়ার জেট, পৌঁছুতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। আরে! এরইমধ্যে হাল ছেড়ে দিল ওরা! নেমিসিসের সব ক'টা ফ্লাড আর সার্চলাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

নাক-মুখ জ্বালা করছে রানার, ভেতরে বালি জমেছে। কর কর করছে চোখ। চারপাশের দুনিয়া যেন বিশাল এক গরম উলের তৈরি একটা মুঠোর ভেতর রয়েছে। রাস্তার ওপর বালির পুরু স্তর জমে গেছে। খালের দিক থেকে জাহাজের আলোর আভা রাস্তার দিকে পৌঁচেছে খানিকটা, লিয়ার জেটটা এতক্ষণে ওর দেখতে পাবার কথা।

ছোটার গতি আপনা থেকেই কমে এল রানার। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল ও। চোখ জ্বালা করে ওঠায় আঙুল তুলে ঘষল বার কয়েক। পথ ভুল করে থাকতে পারে, কিন্তু তা ওর মনে হলো না। ভাল করে চারদিকে চোখ বুলোবার পর নিশ্চিত হলো ও। ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছে।

কিন্তু প্লেনটা নেই কোথাও।

মরুভূমির মাঝখানে ওকে ফেলে চলে গেছে ডাচ জর্জ আর মিলি পুলটিস।

হঠাৎ বিপদের আভাস পেল রানা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

ধূলিঝড়ের ভেতর শক্তিশালী টর্চের আলো এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে।

একদল কে.জি.বি. এজেন্ট পিছু নিয়েছে ওর।

রানা একা, উজিটাও নেই সাথে।

নয়

দু'দিন পরের ঘটনা। ঢাকা থেকে বি.সি.আই-এর চীফ কন্ট্রোলার (অপারেশনস) সোহেল আহমেদ এথেন্স পৌঁছুল। ইতিমধ্যে সুয়েজ ক্যানেলের ঘটনাটাকে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স নেমিসিস ইনসিডেন্ট বলে নামকরণ করলেও, তদন্তে কোন অগ্রগতি হয়নি বলে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেয়া হয়নি বা ঘটনার সাথে জড়িত পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগও করা হয়নি।

এথেন্সে পৌঁছেই, সরাসরি ভ্যাসিলিসিস সোফিয়াস এভিনিউতে চলে এল সোহেল, ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বি.সি.আই. এথেন্স শাখার অফিসটা এখানেই, হিলটন হোটেলের কাছাকাছি। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মিডইস্ট আর ইউরোপে নয় দিনের শুভেচ্ছা সফরে আসছেন, তাঁর এই সফর উপলক্ষে অগ্রবর্তী দলের একজন সদস্য হিসেবে জেনেভা হয়ে এথেন্সে এল সোহেল, বিভিন্ন দেশের বন্ধুভাবাপন্ন ইন্টেলিজেন্স চীফদের সাথে পুরানো সম্পর্ক ঝালাই করে নেয়ার এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে ও।

তার উপস্থিতির খবর একজন সিকিউরিটি গার্ড জানাল চন্দন সরকারকে। গোপন রিপোর্ট, ডোশিয়ে ইত্যাদি টেবিলে গুছিয়ে রাখছিল চন্দন, এই সময় গট গট করে তার অফিস কামরায় ঢুকল সোহেল।

'রানার শেষ খবর?' কোন ভূমিকা না করে সরাসরি জানতে চাইল সোহেল।

নীল সার্জের সুট পরে আছে সে, কোটের একটা আস্তিন নড়াচড়া না করায় বোঝা যায় তার একটা হাত নেই। হাত থাক বা না থাক, তার আত্মপ্রত্যয় এতই প্রবল যে জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে, হীনম্মন্যতায় ভোগে না সে। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে যে-ক'টা অমূল্য রতন আছে তার মধ্যে একজন সোহেল আহমেদ, কানাঘুষা শোনা যায় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান অবসর নিলে চীফ-এর আসনে বসার জন্যে যে দু'জনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তাদের মধ্যে আছে সে। সাধারণ বাঙালীদের চেয়ে একটু বেশি লম্বা সোহেল, ফর্সা। তার সরল খোশমেজাজী চেহারা দেখে যাই মনে হোক, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির অধিকারী সে, প্রয়োজনে জল্লাদের মত নিষ্ঠুর হতে জানে। রানার সাথে তার মানিকজোড় সম্পর্ক।

'কোন খবরই নেই, সোহেল ভাই। মাসুদ ভাই যেন দক্ষিণ মেরুতে হারিয়ে গেছেন।'

'ঈজিপশিয়ানরা কোন আভাস দেয়নি?' প্যাড লাগানো একটা চেয়ারে বসল সোহেল, চন্দনের ডেস্কের কাছাকাছি।

'কিচ্ছু না!' নার্ভাস ভঙ্গিতে লালচে গোঁফ ঠিকঠাক করল চন্দন। 'আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল, তার ঘন কালো চোখে

বরফ শীতল দৃষ্টি। ওয়াকিং স্টিকের মাথাটা মুঠোর ভেতর নিয়ে মোচড়াচ্ছে সে, ওটায় যে আসলে ছোটখাট অনেকগুলো বিচিত্র ধরনের অস্ত্র লুকানো আছে তা খুব কম লোকেই জানে। 'তোমার সমস্ত রিপোর্ট আমার পড়া আছে, চন্দন,' বলল সে, নীল ট্রাউজারের কড়া ভাঁজ একজায়গায় সিধে করল। 'তবু সব কথা তোমার মুখ থেকে আরেকবার আমি শুনতে চাই। আর এক ঘণ্টার মধ্যে প্যারিস থেকে কায়রোর উদ্দেশে রওনা হবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট...তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার করে না যে ব্যাপারটার মধ্যে চরম অপ্রতিভ হবার উপাদান লুকিয়ে রয়েছে?'

নিজের জন্যে কাপে কালো কফি ঢালল চন্দন, চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। সামান্য মাথা নেড়ে আগেই জানিয়ে দিয়েছে সোহেল, সে খাবে না। পাশের কোড রূম থেকে ভেসে আসছে টেলিপ্রিন্টারের একঘেয়ে শব্দ।

'পরশু রাতে মাসুদ ভাই রোডস ত্যাগ করার পর, তাঁর সাথে আমার কোন যোগাযোগ ঘটেনি,' বলল চন্দন, চেয়ার ছেড়ে মিশরের বড় একটা দেয়াল-মানচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রুলারের ডগা দিয়ে সুয়েজ খালের আল-বালাহ্ বাইপাস স্পর্শ করল সে। 'আমার জানামতে এদিকে যাওয়ার কথা তাঁর। পোর্ট সাঈদ থেকে আমাদের ইনফর্মার একটা কনভয় শিডিউল পাঠিয়েছে। দেখে মনে হয়েছে, নেমিসিসে ওঠার জন্যে এটাই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। কিন্তু আমরা এমনকি জানিই না যে মাসুদ ভাইয়ের প্লেন ওখানে পৌঁচেছে কিনা।'

সোহেল বলল, 'সাধারণ কোন দুর্ঘটনায় সাগরে ডুবে গেছে ও, রানার বেলায় আমি তা মেনে নিতে রাজি নই। ওকে যদি মিশরীয়

আকাশে গুলি করে নামানো হত, খবরটা আমরা ইতিমধ্যে জানতে পারতাম। এসো, ধরে নিই, গন্তব্যে পৌঁচেছে ও।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে জানতে চাইল, 'কি ধরনের প্লেন নিয়ে গেছে রানা?'

'বলতে পারছি না। তিনি বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'তাহলে তো সহজে জানার কোন উপায় নেই ইতিমধ্যে সেটা রোডসে ফিরে এসেছে কিনা।'

'অবশ্যই মাসুদ ভাইকে রেখে নয়, সোহেল ভাই। আর, তিনি যদি ফিরতেন, এতক্ষণে নিশ্চয় যোগাযোগ করতেন আমাদের সাথে।'

'জাস্ট কাস্টিং অ্যাবাউট, চন্দন,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোহেল। তার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'ওর চুপচাপ থাকার একটাই অর্থ হতে পারে তাহলে। এখনও মিশরে আছে ও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল চন্দন, তারপর সশ্রদ্ধ বিনয়ের সাথে বলল, 'কথাটা তুলতে আমার ভাল লাগছে না, সোহেল ভাই–তিনি তো মারাও গিয়ে থাকতে পারেন।'

সদয়, মৃদু হাসি ফুটল সোহেলের মুখে, যেন চন্দনের অজ্ঞতা লক্ষ করে কৌতুক বোধ করছে সে। কথা বলল না।

'সোহেল ভাই, আমি...'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সোহেল। 'রানা মারা গেলে আমি জানতে পারব।'

'জ্বী, সোহেল ভাই?' চন্দনের মনে হলো, শুনতে ভুল করেছে সে।

এখনও হাসছে সোহেল। 'রানাকে আমি এত ভালবাসি, ও যদি কোন দিন আমাকে ত্যাগ করে, সাথে সাথে টের পেয়ে যাব আমি। যেমন আমি ওকে ত্যাগ করলে...'

একটু দেরিতে হলেও, চন্দন বুঝতে পারল, সোহেল ভাইয়ের 'আমাকে' শব্দটার মানে হবে এখানে দুনিয়াকে। ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উপলব্ধি করে শুধু বিস্মিত নয়, শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল তার মাথা। 'সোহেল ভাই?'

'বলো?'

'মিশরীয়দের কিভাবে সামলাব? ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়?'

'সাধারণ নিয়ম হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেদের লোক বলে স্বীকার না করা, মিশন পরিত্যাগ করা ও ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া।'

কফির কাপে চিন্তিতভাবে তাকাল চন্দন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, এই কথাই বলবেন আপনি।' তার এই কথার মধ্যে কি যেন একটা চাপা রয়েছে, উপলব্ধি করল সোহেল।

'আমি বলেছি, সাধারণ নিয়ম,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বলল সোহেল। 'কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেখানে মাসুদ রানা, সেখানে সাধারণ নিয়ম খাটবে না, চন্দন। আল্লাহ না করুন, রানার যদি কিছু হয়, অবশ্যই দায়ী প্রতিপক্ষকে চরম দণ্ড পেতে হবে, যাতে পায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। বি.সি.আই-এর ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ বা হীনম্মন্যতায় ভোগার কোন কারণ নেই, তুমিও তা জানো। আমরা প্রতিশোধ নেব। তবে, মিশর বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র, তারা জেনেশুনে রানার ক্ষতি করবে না। রানার যদি কোন ক্ষতি হয়, তার পিছনে হাত থাকবে সি.আই.এ. বা কে.জি.বি-র—কারণ দুটোতেই কিছু কিছু অফিসার আছে যাদের চক্ষুশূল রানা!'

'আর, মিশনটার কি হবে, সোহেল ভাই?'

'নীতির ব্যাপারে সব সময় অটল থাকব আমরা,' বলল সোহেল। 'রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিমভের ব্যাপারে আমাদের

নীতি হলো, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। তবে, তিনি যদি দেশের সাথে বেঈমানী করার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করতে চান, আমরা তাতে বাধা দেব। যদিও, তাঁর দ্বারা এ-ধরনের নোংরা কোন কাজ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু, তুমি অন্য কি যেন ভাবছ বলে মনে হচ্ছে–কি, চন্দন?'

'সোহেল ভাই, আমি ভাবছি...মাসুদ ভাই যেহেতু কোন খবর দিতে পারছেন না, মিশনটা সফল করার জন্যে নতুন আরেকজনকে পাঠালে কেমন হয়? মাসুদ ভাই কি অবস্থায় আছেন আমরা জানি না...'

'যার কাজ তাকে সাজে, চন্দন,' বলল সোহেল। 'অনেক ভেবে-চিন্তে অ্যাসাইনমেন্টটা রানাকে দেয়া হয়েছে, ওর কোন বিকল্প পাওয়া যায়নি। আমি আশা করছি, ও-ই মিশনটা সফল করবে।'

'কিন্তু...?'

'ওকে আমরা পাচ্ছি কোথায়, এই তো?'

'জ্বী।'

এক সেকেন্ড পর সোহেল যেন জনান্তিকে কথা বলতে শুরু করল, 'মিশরীয় প্রেসিডেন্ট যে-কোন সংকটে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে অভ্যস্ত, সমস্যার দ্রুত সমাধান পাবার জন্যে নিয়মের বাইরে যেতেও দ্বিধা করেন না তিনি। ধরে নেয়া চলে, আর কারও মধ্যে এই গুণ দেখতে পেলে খুশিই হবেন ভদ্রলোক।'

'ঠিক বুঝলাম না, সোহেল ভাই।'

'রানার তৎপরতা মিশরের বিরুদ্ধে নয়, সি.আই.এ. আর কে.জি.বি-র বিরুদ্ধে। এটা যদি সতর্কতার সাথে, কূটনৈতিক

কৌশলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন...'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'বলতে চাইছি, চন্দন, আমাদের এজেন্টকে খুঁজে পাবার কাজে তিনি হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করবেন–যদি আমাদের প্রেসিডেন্ট তাঁকে অনুরোধ করেন।'

'মাফ করবেন, সোহেল ভাই। আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে।' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে চন্দনের। 'আপনি কি সত্যি...?'

'সত্যি। রানার জন্যে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট কেন, ঈশ্বরের কাছেও সাহায্য চাইব আমরা। মানুষ চিনতে আমার যদি মারাত্মক ভুল না হয়ে থাকে, ধরে নাও তাঁর সাহায্য আমরা পেয়ে গেছি।'

এক সেকেন্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করল অফিস কামরায়।

তারপর সোহেল বলল, 'বসে আছ কি মনে করে? জেনেভার লাইন দাও, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথা বলতে হবে না আমাকে?'

ফোনে আলাপ করার পর আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল সোহেল। 'আশা করি, বারো ঘণ্টার মধ্যে জানতে পারব কি ঘটেছে।'

'সোহেল ভাই, আপনি তখন বললেন...'

'হ্যাঁ, বলো,' চন্দনকে উৎসাহ দিল সোহেল।

'আপনি বললেন, এই মিশনে মাসুদ ভাইয়ের তৎপরতা কে.জি.বি. আর সি.আই.এ-র বিরুদ্ধে। কে.জি.বি. জড়িত, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সি.আই.এ-র নাম শুনলেও, এখন পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যাচ্ছে না...'

‘কে বলল তোমাকে? সি.আই.এ. তো প্রথম থেকেই রানার পেছনে লেগে আছে।’

‘প্রথম থেকে লেগে আছে?’ চন্দন হতবাক। ‘বলেন কি! মাসুদ ভাই তা জানেন?’

‘কেউ ওকে বলে দেয়নি, তবে আমার ধারণা, সন্দেহ করেছে ও।’

‘কারা তারা…কোথায়?’

আবার সেই সদয় হাসি ফুটল সোহেলের ঠোঁটে। কথা বলল না।

দশ

অবচেতন মনে বিপদের আভাস পেয়ে সজাগ হলো রানা।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওর। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ধুলোবালি আর ঘামে নোংরা হয়ে আছে কাপড়-চোপড়। শরীরটা দুর্বল ও ক্লান্ত।

চড়ুইপাখিদের কিচিরমিচির থেমে গেছে। এক চুল নড়ল না রানা।

কে.জি.বি. এজেন্টদের আসতে দেখে মরুভূমির দিকে রওনা হয়েছিল ও, এগোচ্ছিল দক্ষিণ মুখো হয়ে, জানা ছিল মিষ্টি পানির

যে খালটা কায়রো আর ইসমাইলিয়াকে যুক্ত করেছে সেটা ওদিকেই। কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে দিক বদল করে ও, বুঝতে পারে ওর খোঁজে সুইটওয়াটার ক্যানেল-এর দিকেই যাবে প্রতিপক্ষরা। যদিও, দিক পরিবর্তন করায় কোন লাভ হয়নি। কে.জি.বি. এখনও ওর পিছন পিছন আসছে।

আজ তিন দিন হলো দূর ব্যবধানে ছাড়ানো নিঃসঙ্গ খেজুর গাছের নিচে বা মরুদ্যানের শুকনো ঝোপের পাশে নোংরা পানির কিনারায় লুকিয়ে আছে ও। উজিটা নেই। ভোঁতা নাক .৩৮টা আছে বটে, কিন্তু কার্ট্রিজের সংখ্যা মাত্র চার।

এই মুহূর্তে এল কোয়ানতারার কয়েক মাইল উত্তরে গোটাকতক খেজুর গাছের আড়ালে শুয়ে রয়েছে রানা, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুইটওয়াটার ক্যানেল-এর একটা শীর্ণকায় শাখা। শীর্ণ হলেও, পানির এই ক্ষীণ ধারাটা মরুভূমির মাঝখানে এক সারিতে বেশ কিছু সবুজ গাছপালার জন্ম দিয়েছে।

রানার আশা ছিল, এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবে, তারপর পায়ে হেঁটে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে পোর্ট সাঈদে। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে বাংলাদেশ কনসুলেটে আশ্রয় নেয়া কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে অমূল্য কিছু সময়। মাঝখানের দূরত্ব পেরিয়ে সম্ভবত কাছে চলে এসেছে প্রতিপক্ষরা।

গাছগুলোর শাখা বালি ছুঁয়ে আছে, পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রানা। খামসিন বাতাস নিস্তেজ হয়ে গেলেও, শেষ বিকেলের আকাশে সবুজাভ একটা ধুলোর ভাব রয়ে গেছে এখনও। তাপমাত্রা সহ্যক্ষমতার কাছাকাছি নেমে এসেছে। অনুভব করল, ঘাম আর ধুলোবালি শুকিয়ে গিয়ে প্রতিটি লোমকূপের মুখ বন্ধ

করে দিচ্ছে।

কোথায় কি যেন একটা গোলমাল আছে।

জায়গাটা ছেড়ে সরে যাবার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা, অথচ বিপদটা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। ধীরে ধীরে বসল ও, দাঁড়াল না, ঝোপের আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। মরুদ্যানের উল্টো দিকে তিন পাতা বিশিষ্ট সবুজ লতাগাছ জন্মেছে, গরু-ছাগলের খোরাক। চকলেট রঙের মাটিতে উজ্জ্বল লাগছে খেতটা, গ্রামের বাসিন্দারা অনেক পরিশ্রম করে শাখা খাল থেকে পানি এনে ঢেলেছে খেতে। খেতের কিনারা ঘেঁষে আসছে কে.জি.বি-র দলটা, একজোট হয়ে, গম্ভীর আর মারমুখো।

রানার পায়ের চিহ্ন ধরে আসছে ওরা, সেই রেইলরোড কালভার্ট থেকে। ওখানেই ওদেরকে ফাঁকি দিয়েছিল রানা। ওদিকে একটা পানি সেচা ডোবা আছে। পদচিহ্ন অনুসরণে দক্ষ লোক ওরা, সেই সাথে জেদি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কষ্ট আর সময় যা-ই লাগুক, রানার নাগাল পেতেই হবে ওদেরকে। একজনের কাঁধ থেকে একটা ওয়াকি-টকি ঝুলতে দেখল রানা, ছোট্ট অ্যান্টেনাটা হাঁটার সাথে দুলছে। রানার সন্দেহ, একাধিক পার্টি ওর পিছু নিয়েছে, তবে একটার সাথে আরেকটাকে আলাদা করা অসম্ভব, কাঠামো আর কাপড়চোপড় সবারই একরকম। ইতিমধ্যে জেনেছে ও, পিস্তলগুলো ওরা বেল্টের তলায় রাখে, শার্টের নিচে। পিস্তল হোক আর ছুরি, মৃত্যুটা যন্ত্রণাদায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রানা জানে, প্রথমে আহত করা হবে ওকে, মরণ আঘাতটা হানা হবে কথা আদায় করার পর। যতক্ষণ তারা ওকে মরুভূমি আর নগণ্য ছোটখাট গ্রামের মধ্যে আটকে রাখতে পারছে, ওকে মারার জন্যে কামান দাগলেও কর্তৃপক্ষের কানে খবরটা পৌঁছুবে না।

একটাই সান্ত্বনা রানার, জর্জ আর মিলি নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গেছে নিকোলাই প্যাসিমভকে। কে.জি.বি. এজেন্টদের ওপর তার ব্যাপারে কি নির্দেশ আছে জানার কোন উপায় নেই, দৃশ্যপট থেকে প্যাসিমভ উধাও হওয়ায় ভালই হয়েছে। লোকচক্ষুর আড়ালে প্যাসিমভকে ধরতে পারলে কি করত তারা বলা যায় না। সময় ও সুযোগ মত তাকে যে-কোন রুশ দূতাবাসে পৌঁছে দেয়া যাবে, রিপোর্টারদের চোখের সামনে। যে নির্দেশই দেয়া থাকুক, কে.জি.বি. এজেন্টরা তখন অন্তত প্যাসিমভের অপূরণীয় কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ঝোপের আড়াল নিয়ে পিছিয়ে এল রানা, সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে, সচেতন, প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে প্রতিপক্ষ। গানের তালে তালে একদল মিশরীয় কৃষক কচুরিপানা আর জলজ আগাছা ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, ছোট্ট ডোবাটার দু'দিকে নিজেদের কাজে ব্যস্ত তারা। কারও পরনে ঢোলা গালাবিয়া, আলখেল্লার মত দেখতে, মাথায় খুলি কামড়ে থাকা ক্যাপ। যারা পানিতে নেমেছে তাদের পরনে আন্ডারঅয়্যার আর হাতকাটা গেঞ্জি। ডোবা থেকে তোলা কচুরিপানা একটা গাধাটানা গাড়িতে জড়ো করছে তারা।

ডোবার কিনারায় জড়ো করা ওদের একটা আলখেল্লা পেলে হত, ভাবল রানা। হাত আর মুখ থেকে মাছি তাড়াল ও। লোকগুলোর চোখে ধরা না দিয়ে জিনিসটা পাবার কোন উপায় নেই।

কৃষকদের সামনে এক লোক বিশাল এক মোষের পিঠে বেত মারছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ঘুরছে একটা ওয়াটার হুইল। আরও সামনে দেখা গেল মাটির কয়েকটা ঘর, বড়সড় ইরিগেশন ডিচের

দু'ধারে। পরিখার ঘোলা পানিতে সাঁতার কাটছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, পানির ওপর গলা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ষাঁড়, কিনারায় পানি খাচ্ছে পাঁচ-সাতটা উট আর ভেড়া। কালো বোরখা পরা দুই গ্রাম্যবধূ একটা সরু গলির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, দূরে দাঁড়িয়ে আরেকজন মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। তিনজনের মাথাতেই পানি ভর্তি কলস। এক পাশে, খানিকটা দূরে, খেজুর গাছের নিচে একটা পাইপের খোলা মুখের সামনে ভিড় জমিয়েছে গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা, যে যার কলসে পানি ভরছে। পরনে ডোরা কাটা পা'জামা, সাদা বিড়ালছানা নিয়ে খেলছে এক ছেলে।

গোটা এলাকা শান্ত। আপাতত।

.৩৮টা হোলস্টার থেকে বের করল রানা। ঠিক এই সময় শুকনো একটা ডালে পা পড়ায় মট করে শব্দ হলো। ঝট্ করে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল ও। কে.জি.বি. এজেন্টরা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়েছে, যদিও এখনও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ও। পিস্তল ধরা হাতের তালু ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে। খালি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ থেকে ঘাম মুছল ও।

দেরি করার কোন মানে হয় না, ভাবল রানা। ছুটে পালাতে হবে ওকে। ঝোপ আর খেজুর গাছের আড়াল বেশ কিছুক্ষণ লুকিয়ে রাখবে ওকে, এর বেশি কিছু আশা করার নেই।

ছোট্ট মরুদ্যানটার আকৃতি ঠিক একটা চোখের মত। রানা সিদ্ধান্ত নিল চোখটার অর্থাৎ গ্রামটার কাছাকাছি একটা কোণ থেকে দৌড় শুরু করলে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। ঝোপবহুল কিনারা থেকে বেরিয়ে এল রানা, শিরদাঁড়া বাঁকা করে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখল মাথাটা, বালির ওপর আঁকাবাঁকা সরু

একটা পথ ধরে ছুটল। স্বাভাবিক ও শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে ও। নেমিসিসে দেখে আসা লাশগুলোর কথা মনে করল একবার, যে-কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে শক্ত করল পেশী। কে.জি.বি. এজেন্টরা কঠিন পাত্র, এরইমধ্যে সমূলে বাধা উৎপাটন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা। পথের বালি ওর পায়ের চারপাশে আলোড়িত হলো, ঢুকে গেল জুতোর ভেতর। সবুজ খেতে শেষবেলার রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে।

প্রতিপক্ষ মাথাচাড়া দিল শুকনো ঘাসের স্তূপ থেকে, রানার নাক বরাবর সামনে। ঠিক যেন একটা স্ক্রীনে অকস্মাৎ ফুটে উঠল ছবি।

লোকটা খাটো, বেশিরভাগ মাংস যেন জড়ো হয়ে আছে কাঁধ আর বুকে। সারা মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, ভুরু জোড়া লালচে। রানাকে দেখে তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে। তাজ্জব বনে গেছে।

রানার একটা কাঁধ ধাক্কা দিল তাকে, ঘুরে গেল লোকটা, পড়ে যাবার সময় খামচে ধরল রানাকে।

একসাথে পড়ল ওরা, একজনের ওপর আরেকজন। উত্তপ্ত ধুলো আর শুকনো ঘাসের ওপর শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি, আঁচড়াআঁচড়ি, ঘুসোঘুসি।

প্রথমে লোকটার ওপর পড়ল রানা, কিন্তু ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সে, জোরে শ্বাস টেনে বুকটা এমনভাবে ঝাঁকাল, ছিটকে পড়ল রানা। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হবার সময় তার কণ্ঠনালীতে শক্ত একটা ঘুসি মারল ও, লাগল না, অনুভব করল ইস্পাত কঠিন একটা মুঠো ধাক্কা খেলো ওর কপালে। চোখের পিছনে আগুনে ফুলকি ভাসতে দেখল রানা, মাটির সাথে সজোরে

বাড়ি খেলো পিঠ। গড়াগড়ি খেলো ওরা, হিসহিস করে দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস ছাড়ল, গোঙাল, অবশেষে রানার বুকের ওপর উঠে বসল প্রতিপক্ষ।

তার নাকের ডগা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ব্যথায় ও রাগে ফোঁপাচ্ছে সে। দু'হাতের আঙুল রানার গলার নরম মাংসে সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, ইচ্ছা, ওর কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে আনবে। চোখে রক্তলাল উল্লাস দেখা গেল।

তার হাত সরাবার কোন চেষ্টা না করে, যতটা সম্ভব চিবুক নামিয়ে গলাটাকে বাঁচাতে চাইল রানা, একই সাথে হাতের তালু দিয়ে চাপ দিল ঘাম আর রক্তে ভেজা প্রতিপক্ষের মুখে, নাকে আর চোখে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল লোকটার মুখ, রানার তালুর পাশ দিয়ে তার রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মর ব্যাটা! মর, মর শালা!'

লোকটার ঘাড়ে অপর হাতের দুটো আঙুল ঢোকাল রানা, উঁচু করা চোয়ালের নিচের কোণে, ব্রেনে উঠে যাওয়া রক্তপ্রবাহে চাপ পড়ল। ওদিকে রানার গলায় লোকটার আঙুলগুলো ঢুকছে তো ঢুকছেই, চামড়া ওঠা মাংসে হুহু করে জ্বালা ধরে গেল। প্রতিপক্ষকে চিনতে ভুল করেনি রানা, লোকটা অতিরিক্ত উৎসাহী। বোধহয় সেজন্যেই সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকেনি সে। কোনমতে রানাকে ছাড়তে রাজি নয় সে, যদিও তার মাথা ঘুরছে ও ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো।

আচমকা একটা লাথি মেরে লোকটাকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা, হাতের মুঠোয় খপ্ করে এক গোছা চুল ধরল, মাথাটা ঠুকে দিল মাটির সাথে। তার চুল না ছেড়ে, শুয়ে পড়ল রানা, বুঝতে পারল আচ্ছন্ন বোধ করছে প্রতিপক্ষ। হাঁটু ভাঁজ করল ও, সিধে

করল লোকটার ঘাড় লক্ষ্য করে। অপর পা-টা উন্মুক্ত গলার দিকে বাড়াল। দুই গোড়ালি এক করায় কাঁচির আকৃতি পেল পা জোড়া, মাঝখানে আটকে আছে প্রতিপক্ষের গলা। ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল রানা। জানে, এভাবেই লোকটাকে বেহুঁশ করতে হবে। সামনাসামনি মারপিট করে পারা যাবে না।

দ্রুত, খসখসে আওয়াজ পেল রানা পিছন থেকে, তারপরই কর্কশ একটা গলা। 'ছাড়ো ওকে। তা না হলে মরবে।' স্লাভিক উচ্চারণ, ভাষাটা ইংরেজি।

হতাশায় দুর্বল বোধ করল রানা, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ হলো নিজের ওপর। পায়ের পেশীতে ঢিল দিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিল ও, মাথা ঘোরাল নবাগতকে দেখার জন্যে।

ওর দু'চোখের মাঝখানে কপালের ওপর লাগল বুটের লাথিটা।

নড়ল না, স্থির পড়ে থাকল রানা। মাথাটা দপ দপ করছে, ছুটোছুটি না করে শুয়ে থাকতে পারায় ভাল লাগছে ওর। তারপর যখন চোখ মেলল, সব কিছু হলুদ, সবুজ আর ঝাপসা লাগল। সময় বয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে দৃষ্টি। রাশিয়ানদের যেন কোন তাড়া নেই, যথেষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিল তারা।

ওদের লীডার, লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি, লম্বাটে মুখের অধিকারী, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া, সব মিলিয়ে একজন পরিশ্রমী চাষীর চেহারা। মুখের হাড় বেরিয়ে আছে, চোখের নিচে কালি, দেখে মনে হলো লড়াই শেষ হওয়ায় খুশি হয়েছে সে। অজ্ঞান লোকটাকে অভিশাপ দিল লেফটেন্যান্ট, গাধা বলে গাল দিল, দু'জন লোককে ডেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার

নির্দেশ দিল। তারপর ওয়াকিটকির সুইচ অন করে রানার ধরা পড়ার খবরটা রিপোর্ট করল সে।

সূর্য দিগন্তরেখা ছোঁবে, এই সময় খেজুর বাগান থেকে রানাকে নিয়ে বেরুল দলটা। বাতাসে মশলার গন্ধ পেল রানা, গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসছে। সামনের প্রসারিত মাঠ, সোনালি রঙ নিয়ে মরুভূমির একটা উত্থান বা বালিয়াড়িতে গিয়ে মিশেছে। মাটির তৈরি গ্রামের ঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের কল-কাকলি, আরবী বর্ণমালার সচিৎকার উচ্চারণ, নারীকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। সমতল ছাদসহ বাড়িগুলোর সামনে কাউকে দেখা গেল না, কোন বাধা না পেয়ে নিঃশব্দে কাছে চলে এল দলটা।

গ্রামের ভেতর একটাই সরু গলি।

গলিটার শেষ মাথা থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।

একটা দরজার সামনে থামল লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি, তার আগে সবাই তারা যার যার অস্ত্র লুকিয়ে ফেলেছে। কাঠের দরজায় টোকা দিল সে। ঘরের ভেতর রেডিওতে বেহালা বাজছে, সুরটা করুণ।

কেউ সাড়া দিল না দেখে দরজার গায়ে চাপ দিল জাগোরস্কি, চৌকাঠের সাথে চামড়া দিয়ে বাঁধা কবাট ধীরে ধীরে খুলে গেল। সাবধানে ভেতরে পা রাখল সে, বাকি দু'জনকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল। তাদের একজন ধাক্কা দিয়ে প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতর ঠেলে দিল রানাকে।

ছোট্ট একটা কামরায় রয়েছে ওরা, ঘর না বলে জায়গাটাকে ঘেরা বারান্দা বলাই ভাল। সামনে একটা উঠন, ছাগল আর মোরগের ডাকের সাথে বেহালার আওয়াজটা ওদিক থেকেই আসছে। উঠনের দু'দিকে পাশাপাশি কয়েকটা ঘরের দরজা দেখা

গেল, পিছন দিকে মাটি দিয়ে প্লাস্টার করা একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। মুরগীর খুপরি, চুলো, ছাগলের ঘর আর পারিবারিক ল্যাট্রিন, সব পাশাপাশি। চুলোয় আগুন জ্বলছে, পোড়া রুটির গন্ধ ভেসে এল। চুলোর সামনে বসে রয়েছে আলখেল্লা পরা দু'জন মহিলা, সম্ভবত মা আর মেয়ে।

'ওদিকে আমি যাব না,' বলল রানা।

খেঁকিয়ে উঠল জাগোরস্কি। 'যাবে না!'

'ওরা পর্দা মেনে চলে,' বলল রানা। 'অচেনা পুরুষের সামনে বেরোয় না। সাড়া না দিয়ে ভেতরে ঢুকলে গ্রামের পুরুষরা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে আসবে।'

'সে-সব আমরা সামলাব,' বলল জাগোরস্কি।

'ঠিক আছে, আগে তুমি যাও।'

এক সেকেন্ড রানাকে দেখল জাগোরস্কি, তারপর সামনে বাড়ল সে, তার পিছু নিল সঙ্গী দু'জন, তাদের মাঝখানে থাকল রানা। ডোরা কাটা পা'জামা পরা এক লোক খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা পায়রার গায়ে হাত বুলাচ্ছে, তার দৃষ্টি এখনও ওদের ওপর পড়েনি।

'ওহে, শুনছ, এই যে এদিকে!' রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে আরবী ভাষায় ডাকল জাগোরস্কি।

মহিলা দু'জন আঁতকে উঠল, ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে। সটান উঠে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় চাপা দিল তারা। হাতের পায়রাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিল লোকটা। তার বুক ভেতর দিকে দেবে আছে, মুখে প্রায় কোন মাংস নেই, হাড় বেরিয়ে আছে কপালের। বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব, পঁয়ত্রিশও হতে পারে, আবার পঞ্চান্ন হওয়াও বিচিত্র নয়। 'আমার বাড়িতে কি করছ

তোমরা?' কর্কশসুরে খেঁকিয়ে উঠল সে, লম্বা হলদেটে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'বেরোও!'

'তোমার বাড়িটা আমরা কিছু সময়ের জন্যে ভাড়া নিতে চাই।'

ধমক দিল মিশরীয় কৃষক, ত্রস্ত পায়ে ছুটে পালাল মহিলারা। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ তোমরা? কি বললাম শোনোনি? আমার বাড়িতে বিদেশী কুকুর! এত সাহস তোমাদের, মুসলমান বাড়ির বউ-ঝির পর্দা নষ্ট করো!'

'এই নাও,' পকেট থেকে একমুঠো পিয়াসতার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল জাগোরস্কি। 'তোমার বাড়িটা ব্যবহার করার জন্যে আমি টাকা দিচ্ছি।'

জাগোরস্কির হাতে থাবা মারল লোকটা, ভেজা ভেজা ছাগল লাদায় ভরা উঠনে ছড়িয়ে পড়ল নোটগুলো। লোকটার ক্রোধ আর লাফালাফি লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে গেল জাগোরস্কি। তীরের মত ছুটে গিয়ে উঠনের কোণ থেকে একটা ভাঙা ডাল তুলে নিল লোকটা, সেটা মাথার ওপর বন বন করে ঘোরাতে শুরু করে দলটার কাছাকাছি ফিরে এল সে। রাগে ফুঁসছে, চিৎকার করছে, যদিও তার একটা কথাও বোঝা গেল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। কাঁধ ঝাঁকাল তারা, অপ্রতিভ চেহারা।

'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম,' বলল রানা। 'ওরা মুসলমান, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করে। পরিবারের মেয়েদেরকে আমরা দেখে ফেলায় মাথায় রক্ত উঠে গেছে ওর। ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ এ-সব তোমাকে শেখানো হয়নি?'

ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে জাগোরস্কি বলল, 'তুমি চুপ

করো! এ-ধরনের পরিস্থিতি কিভাবে সামলাতে হয় আমার জানা আছে।'

'কিভাবে সামলাতে হয়?'

'এভাবে,' বলেই শার্টের ভেতর থেকে নাইন এমএম. ম্যাকারভ পিস্তল বের করল জাগোরস্কি। 'বেরোও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'বাড়ি থেকে সবাই তোমরা বেরিয়ে যাও! বেশ্যাগুলোকে নিয়ে দূর হও চোখের সামনে থেকে! পর্দা, মুসলিম নারী–ছোহ্!'

'মুখ সামলে কথা বলো।'

কিন্তু রানাকে গ্রাহ্যই করল না জাগোরস্কি।

তার হাতে পিস্তল দেখে পিছিয়ে গেল কৃষক লোকটা, কিন্তু চোখ দুটো দু'টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগল। বাড়ির মেয়েদের ডাকল সে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দরজা টপকে বেরিয়ে এল তারা, হন হন করে পাশ কাটাল ওদেরকে, তাদের পিছু পিছু ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেল বাড়ির কর্তা।

'কাজটা তুমি ভাল করলে না,' গম্ভীরমুখে বলল রানা।

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরেই সরাসরি ওর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল জাগোরস্কি, পিস্তল ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে। একটা ঢোক গিলল রানা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল জাগোরস্কি, চট করে রাস্তার দিকের বারান্দাটার দিকে তাকাল একবার, তারপর রানাকে বলল, 'হাত দুটো মাথার পিছনে তোলো, তারপর বসো ওখানে।'

নির্দেশ পালন করল রানা। আশা ও আশঙ্কায় দুলছে ওর মন। জাগোরস্কি বোকামি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তার বোকামিটা ওর জন্যে শুভ হয়ে দেখা দিতে পারে। কৃষক লোকটা এই অপমান সহ্য করবে বলে মনে হয় না, তার সাহায্যে

গ্রামবাসীরাও সদলবলে এগিয়ে আসবে। তারমানে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। জাগোরস্কি নির্বিচারে খুন করবে। গ্রামবাসীরা সংখ্যায় বেশি, কাজেই শেষ পর্যন্ত জিতবে তারাই, ধরে নেয়া চলে। প্রশ্ন হলো, নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে ওকে তারা রেহাই দেবে কিনা।

রুটির পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস, তার সাথে মিশে আছে বিভিন্ন দুর্গন্ধ। সন্ধ্যা নামছে মরুভূমিতে, চুলোর আগুন কাঁপা কাঁপা ছায়া ফেলছে উঠনের কিনারায়।

জাগোরস্কির সঙ্গী দু'জন ঘরগুলোর ভেতর উঁকি দিয়ে ফিরে এল উঠনে। একধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করছে তারা। নোংরা উঠনে পায়চারি শুরু করল জাগোরস্কি। এক সময় হাঁক ছেড়ে হ্যারিকেন জ্বালার নির্দেশ দিল সে।

তার একজন লোক হ্যারিকেন জ্বালল, অপরজন অন করল রেডিওটা।

কান পাতল রানা। গোটা গ্রাম হঠাৎ করে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। জাগোরস্কির দিকে তাকাল ও। এখনও পায়চারি করছে সে, যদিও চেহারায় কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। হাঁটাহাঁটি করছে বটে, কিন্তু কড়া নজর রেখেছে রানার ওপর। তার সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। আবার নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছে তারা। কারও মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই।

তারমানে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে ওরা।

কি ঘটতে পারে? ভাবল রানা। কেউ আসবে? তারপর ওর মনে পড়ল, একাধিক পার্টি পিছু নিয়েছিল ওর। অজ্ঞান লোকটাকে কোথাও সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। উঠনে সেই একই দৃশ্য, কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময় আওয়াজটা পাওয়া গেল।

‘হো হো। কমরেড রানা! সত্যি তুমি নাকি?’

বারান্দার দরজা জুড়ে প্রকাণ্ডদেহী কর্নেল ভ্লাদিমির রুস্তমভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা।

এগারো

‘দাঁড়াও, বন্ধু,’ কর্নেল রুস্তমভ বলল রানাকে। ‘উঠে দাঁড়াও।’

‘তোমাকে আগেও বলেছি, আমরা বন্ধু নই।’

‘একি অবস্থা হয়েছে তোমার! আমার লোকেরা…এক্কেবারে অগা! ওরা কি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে? স্রেফ ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার, কমরেড রানা।’ সাইবেরিয়ান চোখের তির্যক দৃষ্টি ফেলে রানাকে সিধে হতে দেখল সে।

পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে রানার, সারা শরীরে ব্যথা ও অবসাদ। দৃষ্টি ঝাপসা লাগায় মাথাটা একবার ঝাঁকাল ও।

নিঃশব্দে হাসল রুস্তমভ। ‘সাংঘাতিক দৌড় খাটিয়েছ তুমি আমাদের, এ-টুকু প্রশংসা করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে তোমার। এখন?’

‘এখন কি?’

‘তিনি কোথায়, নিকোলাই প্যাসিমভ?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘জানি না।’ বাম হাঁটুর পিছনে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ব্যথা পেল ও, ভাঁজ হয়ে গেল পা, নোংরা মাটিতে আছাড় খেলো। কিডনির কাছে আবার লাথি খেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা শরীর। পড়ে থাকল রানা, বাতাসের জন্যে হাঁপাচ্ছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী আঘাতের জন্যে। নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করছে রুস্তমভ, গাল পাড়ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, তারা যেন নতুন রিক্রুট। তারপর তার মস্ত থাবার স্পর্শ পেল রানা। ‘কিছু মনে কোরো না, দোস্ত। নাও, হাতটা ধরে উঠে পড়ো। আবার দাঁড়াও।’

দুর্বল, উঠতে ইচ্ছে করল না রানার, তবু শুধু আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে কোন রকমে সিধে হলো ও। ঠাণ্ডা চোখে সারাক্ষণ নজর রাখল ওর ওপর কর্নেল রুস্তমভ, চেহারায় নির্লিপ্ত কাঠিন্য, সাইবেরিয়ান বরফের মত। গ্রীক মার্চেন্ট মেরিন অফিসারের ইউনিফর্মে ঢাকা বিশাল কাঠামোর সাথে সার্কাসের বিকট ভল্লুকের মিল রয়েছে। বোতাম খোলা টিউনিকের নিচে ঘামে ভেজা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। লোকটা কি রকম বিপজ্জনক, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই রানার। কে.জি.বি-রই অনেক অফিসারের জন্যে একটা আতঙ্ক সে, স্যাডিস্ট এবং প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্র। মরক্কো, জাপান আর শ্রীলংকায় ওদের দেখা হয়েছিল, সে-সব তিক্ত স্মৃতি আজও ঘায়ের মত দগদগ করছে রানার মনে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, প্রতিবারই রানাকে ক্লান্ত আর অসহায় অবস্থায় পেয়েছে কর্নেল রুস্তমভ। প্রতিবারই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে রানা, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে

করেছে।

এবারও ঠিক তাই ঘটছে, ক্লান্ত আর অসহায় বোধ করছে রানা। কিন্তু এবার কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে ও?

আশার কোন আলো দেখতে পেল না রানা।

'তুমি সুস্থবোধ করছ তো, রানা?' কণ্ঠে উদ্বেগ নিয়ে কথা বলছে কর্নেল। 'আমার লোকেরা ভয়ানক রেগে আছে, তোমাকে খুন করার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, কমরেড রানা?'

'পারছি,' বলল রানা, বেসুরো গলায়।

'তাহলে প্লিজ...,' প্রকাণ্ড বুকে সশব্দে বাতাস ভরে নিল কর্নেল, '...তোমাকে আমার জেরা করতে হবে। তুমি স্বেচ্ছায় কথা বলবে এ আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু অত্যন্ত সিরিয়াস...'

'তাছাড়া, নেকড়েগুলোকে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তা-ও তুমি জানো না, তাই না? ওরা ধৈর্য হারিয়ে আমার ঘাড় মটকালে তোমাকে দায়ী করা যাবে না।'

'হো হো! ঠিক তাই, বন্ধু!' হাসির সাথে কর্নেলের প্রকাণ্ড মুখে চর্বি আর মাংসের ভাঁজ পড়ল। 'তুমি তাহলে সহযোগিতা করবে?'

'আমি তোমাকে বলেছি...'

'প্লিজ, কমরেড কর্নেল,' লেফটেন্যান্ট জাগোরস্কি আবেদন জানাল। 'ওকে আমার হাতে তুলে দিন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, গ্রামোফোন রেকর্ডের মত গান গাইবে ও, সব প্রশ্নের উত্তরই আপনি পেয়ে যাবেন। তা যদি না হয়, গুস্তাফ তাতাভস্কির কপালে যা ঘটেছিল ওর কপালেও তাই ঘটবে। আমরা ওর ভাইটাল পার্টসগুলো ছিঁড়ে নেব।'

‘চোপ!’ গর্জে উঠল কর্নেল। ‘বর্বর, অসভ্য কোথাকার! এরকম নিষ্ঠুর হওয়ার কথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে? গুস্তাফের পুরুষত্ব কেড়ে নিয়ে রানা যা করেছিল তাকে কি বলা যায়? বর্বরোচিত? পৈশাচিক? মর্মন্তুদ? বীভৎস? আসলে গুস্তাফের ক্ষতিটা ব্যাখ্যা করার মত কোন শব্দ দুনিয়ার কোন অভিধানে নেই। রানা করেছে করেছে, কিন্তু ওর অত বড় ক্ষতি আমরা করতে পারি না।’ রানার দিকে ফিরল সে। ‘বুঝতেই পারছ, রানা, আমার লোকদের সামলে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। ওরা যদি সত্যি সত্যি গুস্তাফের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে...’

‘তুমি ওদেরকে বাধা দিতে ব্যর্থ হবে,’ বিদ্রূপের সুরে বলল রানা, যদিও ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে ওর। গুস্তাফ তাতাভস্কির কথা ভোলেনি ও, ভোলা সম্ভব নয়।*

‘ব্যর্থ হব,’ রানার কথার প্রতিধ্বনি তুলল কর্নেল।

‘তোমরা যে লোককে চাইছ, তিনি গায়েব হয়ে গেছেন।’ রানার মুখের সামনে মুখ বাড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল জাগোরস্কি, ‘এ-সবে কাজ হবে না, সাম্রাজ্যবাদীর পা চাটা কুকুর। তুমি যে সি.আই.এ-র চর, এ আমাদের খুব ভাল করেই জানা আছে। যদি নিজের ভাইটাল পার্টগুলোর ওপর দরদ থাকে, সত্যি কথা বলো।’ জাগোরস্কিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কর্নেল। ‘রানা, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে রক্ষা করব, তুমি যদি মুখ খোলো,’ বলল সে, চেহারায় ব্যগ্রতা নিয়ে।

চুপ করে থাকল রানা।

---

* পালাবে কোথায় ১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজের সাথে ঘৃণা আর আক্রোশ প্রকাশ করল জাগোরস্কি। 'কমরেড কর্নেল, আপনি অনুমতি দিলে ওকে আমরা পোড়াতে পারি। ধীরে ধীরে। প্রথমে একটা আঙুল, তারপর গোটা একটা হাত, এভাবে। কথা না বলে যাবে কোথায়?'

মৃদুকণ্ঠে কর্নেল বলল, 'পোড়া গন্ধটা আমি আবার সহ্য করতে পারি না। পোড়া গন্ধের একটা খারাপ দিক হলো, ওটা তোমার সাথে থেকে যায়–বিশেষ করে নাকের ভেতর।' রানার দিকে ফিরে উৎসাহ দিয়ে হাসল সে। 'এসো, নতুন করে শুরু করি, কেমন? নিকোলাই প্যাসিমভ কোথায় আছেন, প্লিজ?'

'আমি জানি না,' বলল রানা, কিডনির ব্যথাটা সম্পর্কে সচেতন ও, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে সারাক্ষণ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর।

'সত্যি কথা বলো, রানা!' প্রকাণ্ডদেহী সাইবেরিয়ান মিনতি জানাল।

'সত্যি কথা বলছি, ব্যাপারটা রহস্যময়।'

জাগোরস্কির লাথিটা দেখতে পায়নি রানা, আগের মতই আবার মাটির ওপর ছিটকে পড়ল ও। পরমুহূর্তে শিরদাঁড়াটা যেন গুঁড়িয়ে গেল, বিরতি ছাড়াই অসাড় করে দেয়া আঘাতগুলো ক্ষতবিক্ষত করতে থাকল শরীরটাকে। ভাঁজ করা হাতের নিচে যতটা সম্ভব মাথাটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল ও। মনে পড়ল, জীবনে কখনও এভাবে পড়ে পড়ে মার খায়নি।

'যথেষ্ট!' হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল। 'থামো এবার!'

কথাগুলো কোন রকমে, অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। অনুভব করল, কে যেন ওর শার্টের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, বসার ভঙ্গিতে উঁচু করল ওকে ছাগল-লাদার ওপর।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কর্নেল, গোলাকার প্রকাণ্ড মুখটা কাছে আনল। অস্পষ্ট, ঝাপসা অবয়বটার দিকে মাথা ঘোরাল রানা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, বুকের ওপর নেমে এল চিবুক, উপলব্ধি করল কে যেন ওর পিঠের দু'দিকে হাত রাখল।

রুস্তমভ কথা বলল বিষণ্ন সুরে, খেদ প্রকাশ করার ঢঙে, যদিও রানার কানে বিশ্বাস্য ঠেকল না, 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, গোটা ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝির পরিণতি মাত্র। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি। নিকোলাই প্যাসিমভ নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি আমাদেরকে পরিষ্কার জানিয়েছেন...'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কেটে গেল। চাইলেও একজোড়া শব্দ সাজিয়ে কিছু বলার শক্তি নেই রানার। চোখ বন্ধ রেখে নিরেট কিছু ধরার জন্যে হাতড়াতে ইচ্ছে করল ওর, যেন তলিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। নাকে রক্তের গন্ধ পেল।

'কি ওটা?'

রুস্তমভের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ সতর্কতার রেশ, ধরতে পারল রানা। চোখ মেলে ওপর দিকে তাকাল ও, দেখল শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল, মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করা। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

কান পাতল রানাও।

এক মুহূর্ত পর শুনতে পেল ও। অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন, দূর থেকে ভেসে আসছে। সম্ভবত গ্রামের সরু পথটা থেকে।

তাড়াতাড়ি রানার দিকে ফিরল কর্নেল। 'আবার চেষ্টা করো, বন্ধু। প্রশ্নটা কি তুমি জানো।'

গ্রামবাসীদের উত্তেজিত গুঞ্জন নতুন শক্তি এনে দিয়েছে রানাকে। 'দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার? প্যাসিমভ আমার কাছে আছেন? কোন্ পকেটে?'

'স্বইচ্ছায় জাহাজ থেকে তিনি কোথাও যাবেন না। তুমি নিশ্চয়ই কোথাও তাঁকে বন্দী করে রেখেছ।'

'রাশিয়া থেকে তো নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে এলেন,' জবাব দিল রানা।

'তোমার সাথে আরেকজন লোক ছিল, তাই না? প্যাসিমভ কি তার কাছে আছে?'

জাগোরস্কি হঠাৎ অস্থির গলায় বলল, 'গ্রামবাসীরা এদিকেই আসছে, কমরেড কর্নেল!'

ঘেরা বারান্দার দিকে ঝট্ করে তাকাল রুস্তমভ। 'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' নির্দেশ দিল সে।

'লোকটার ওপর আপনি আমাকে ছুরি চালাবার অনুমতি দিন, প্লিজ...'

দ্রুত কথা বলল রুস্তমভ, 'চুপ করো! দরজাটা বন্ধ করো, যাও।' রানার দিকে ফিরল সে। 'কোথায় তারা, রানা, তোমার সঙ্গীরা আর নিকোলাই প্যাসিমভ? হাতে বেশি সময় নেই, বুঝতেই পারছ।'

'আমার বিশ্বাস, নাগালের বাইরে চলে গেছে।'

'আমাদের হাতও খুব লম্বা, রানা। কোথায়? নাকি তুমি চাও, আমার লোকদের ঠেকাতে আমি ব্যর্থ হই?'

রানা উপলব্ধি করতে পারছে, কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ওকে। কে.জি.বি-র ইন্টারোগেশনের মুখে অটল থাকতে হবে, মুখ খোলা চলবে না। শেষ পর্যন্ত কি সফল হবে ও? সহ্য করতে

পারবে ওদের টরচার? মুখ খোলা মানে পরাজয়, মরে যাওয়াও তাই। ঠোঁট মুছল ও, হাতের উল্টোপিঠে সরু রক্তের দাগ লাগল।

ফিরে এল জাগোরস্কি। ‘জবাব দাও!’ শাসাল সে।

রানা নিরুত্তর।

এবারের নির্যাতন কতক্ষণ স্থায়ী হলো বলতে পারবে না ও। প্রথম তিনটে ঘুসি আর লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাল। অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল, লাঠিপেটা করা হচ্ছে শরীরটাকে। বোধ আচ্ছন্ন হলেও, ছুরির ডগা দিয়ে খোঁচা মারার মত ব্যথা অনুভব করল। তারপর বিরতির সময় মনে হলো শূন্যে ভেসে আছে, অন্ধকারটা ঠিক নির্ভেজাল নয়। অস্বস্তিকর আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর বলে চিনতে পারল। চিৎকার আর গালাগাল ভেসে এল উঠনের সামনেটা থেকে, মাঝখানে পাঁচিল থাকায় ভোঁতা লাগল। কাছ থেকে শোনা গেল রুস্তমভের ভারি গলার কর্তৃত্বসুলভ সুর, ‘তাহলে আমরা কেটে পড়ি এসো। কোথায় মিলিত হতে হবে তোমরা জানো…’

মুখের পাশে মাটির স্পর্শ অনুভব করতে পারল রানা, চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ও। টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে রুস্তমভ, সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয় প্রকাণ্ড স্ট্যাচুর মত লাগল তাকে। জাগোরস্কির হাতে একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল সে। ‘ওকে নিয়ে কি করা হবে?’ মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল জাগোরস্কি।

রাস্তার শোরগোলটা অকস্মাৎ বাড়ল। কাঠের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে লোকগুলো।

রুস্তমভ বলল, ‘ফেলে যাও।’

‘আমি প্রতিবাদ করছি, কমরেড কর্নেল। ওকে বাঁচিয়ে রাখা

অপরাধ।' জাগোরস্কির কথায় তর্কের সুর।

গম্ভীর গলায় রুস্তমভ বলল, 'ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ, কি ঘটতে যাচ্ছে? বাড়ির লোকটাকে অপমান করে গোটা গ্রামবাসীকে খেপিয়ে দিয়েছ তুমি। তবে, তোমার এই বোকামির জন্যে এই একবার আমি খুশি হয়েছি। বাইরে ওরা যারা চিৎকার করছে, বুঝতেই পারছ, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে ওদের। আমাদের হয়ে কাজটা ওরাই করবে। রানাকে আমরা যদি খুন করি, আর পরে যদি মিশরীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ি, তখন কি হবে?'

দু'জনের মাঝখানে উত্তপ্ত নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নড়ল না রানা।

উঠনের বাইরে থেকে গ্রামবাসীদের গর্জন ভেসে আসছে।

'ও আপনার পুরানো বন্ধু, অন্তত খানিকটা দয়া আপনার দেখানো উচিত,' বলল জাগোরস্কি, 'পুরানো বন্ধু' বলার সময় তার সুরে খানিকটা বিদ্রূপ ও অভিযোগের সুর ফুটল। 'আমার ধারণা, ওকে আপনি নিজের হাতে খুন করলে বা ও যদি আপনার চোখের সামনে খুন হয়, ওকে দয়া করার সাথে সাথে খানিকটা সম্মান দেখানোও হবে। উন্মাদ গ্রামবাসীরা ওকে ধরে ছিঁড়ে ফেলবে, টুকরো টুকরো করবে, সেটা ওর জন্যে অপমানজনক নয়?'

'হো হো। তোমাকে আরও অনেক শিখতে হবে, লেফটেন্যান্ট, যদি বাঁচো, যদি এই পেশায় সারভাইভ করো। এখনকার পরিস্থিতি হলো, আমরা নতুন নির্দেশ পেয়েছি, সেটা পালন করার জন্যে তুমি আমার আদেশ মেনে নেবে। সবাইকে নিয়ে চলে যাও–জলদি!'

এবার আর তর্ক করল না জাগোরস্কি। ত্রস্ত পায়ের মৃদু শব্দ

শুনতে পেল রানা, মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে হিংস্র গ্রামবাসীদের শোরগোলের ভেতর চাপা পড়ে গেল সেটা। চোখ তুলে তাকাল রানা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রুস্তমভ।

ঠোঁট টিপে হাসল সে, তারপর দলটার পিছু নিল।

চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে গেল রুস্তমভ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু রানার মনে হলো তার এই আচরণের পিছনে সঙ্গত একটা কারণ না থেকে পারে না। নিজের হাতে রানাকে খুন করার সুযোগ পেয়েও সেটা হাতছাড়া করার পাত্র কর্নেল রুস্তমভ নয়। গ্রামবাসীরা হয়তো ওকে খুন করবে, কিন্তু নিজের হাতে মারার সন্তুষ্টিই আলাদা, সেটা থেকে রুস্তমভ নিজেকে বঞ্চিত করল কেন?

কারণটা জানা নেই রানার, তবে আন্দাজ করতে পারল।

কে.জি.বি-তে সুস্থমস্তিষ্ক লোকের অভাব নেই, এমনকি রানার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আছে, আছে শুভানুধ্যায়ী। তাদের মধ্যে অনেকেই রুস্তমভের চেয়ে বড় পদের অধিকারী। রানা ধারণা করল, রুস্তমভের ওপর কড়া হুকুম আছে, রানাকে খুন করা যাবে না। সম্ভবত এ-ধরনের একটা হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা কর্নেলের নেই। সে জন্যেই রানার মৃত্যুর সাথে সরাসরি নিজেকে জড়াল না সে। কিন্তু লোকটাকে অমন খুশি দেখাল কেন?

দলটা সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির ছাদে উঠে যাচ্ছে, সেদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। রানার মনটা একাধারে স্বস্তি ও আশংকায় ভারি হয়ে উঠল। কর্নেল রুস্ত মভ ওকে একটা সুযোগ দিয়ে গেছে, যতই নগণ্য হোক সেটা। রানার দুর্ভাগ্য বলতে হবে, সুযোগটা গ্রহণ করার শক্তি বা সামর্থ্য

নেই ওর।

রাশিয়ানরা কোন্ দিকে যাচ্ছে? প্রশ্নটা নিয়ে মাত্র এক সেকেন্ড চিন্তা করার অবকাশ পেল রানা। তারপরই শুনতে পেল দরজা ভাঙার আওয়াজ। এতই দুর্বল, দৌড়াবার কথা ভাবা যায় না। তবু চেষ্টা করল রানা। প্রতিবাদ করছে শরীর, নেতিয়ে পড়তে চাইছে। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, সগর্জনে নৃত্যরত কয়েকটা মূর্তি সদ্য বিস্ফোরিত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে উঠনে ছড়িয়ে পড়ছে। মশাল, টর্চ আর হ্যারিকেনের আলোগুলোকেও নাচানাচি করতে দেখল রানা। মশালের লালচে আলোয় মিশরীয় কৃষকদের চেহারা রক্তস্নাত বলে মনে হলো। কঁক কঁক করতে করতে চারদিকে ছুটোছুটি করছে এক ঝাঁক মুরগী। অকস্মাৎ লোকগুলো যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল, দ্বিগুণ হলো তাদের গর্জন, রানাকে দেখে ফেলেছে।

পাথর, লাঠি, থালা-বাসন, হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ল তারা। ঝাঁকি খেয়ে ডান দিকে সরল রানা, মাথা নিচু করে বাম দিকে ফিরল, কমলা রঙের আলোর ভেতর দিয়ে ছুটে এসে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বৃষ্টির মত পড়ছে ওর গায়ে। গোটা অস্তিত্বে মৃত্যুর ছোঁয়া আর স্বাদ পাচ্ছে ও, তবু থেমে নেই, ছুটছে, প্রতি মুহূর্তে সচেতন হিংস্র জনতা কাছে চলে আসছে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছুল রানা, এটাই ওর পালাবার একমাত্র পথ, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। স্যাৎ করে এগিয়ে এল একটা হাত, ধাপ থেকে কেড়ে নিল ওর একটা গোড়ালি। এক পায়ে লাফাতে শুরু করল রানা, বন্দী পা-টা ছাড়াবার জন্যে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও, কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, চোখের

কোণ দিয়ে দেখতে পেল সিঁড়ির নিচ থেকে অসংখ্য হাত ওপর দিকে উঠে আসছে, হাতগুলোর পিছনে মানুষগুলোর চোখে খুনের নেশা।

তারপর পড়ে গেল রানা। চোখের পলকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। ঘুসি আর লাথি মারছে, আঁচড়াচ্ছে, খামচাচ্ছে, চুল আর হাত-পা ধরে টানছে, যার যেমন সুবিধে।

একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ওপরের একটা ধাপ থেকে ধুলো উড়ল।

রানাকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো লোকগুলো, ধাপের গায়ে সদ্য তৈরি দাগটার দিকে তাকাল।

'ছেড়ে দাও ওকে!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল কে যেন।

মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল ভিড়টা। গাল পাড়ছে লোকগুলো, রানার গায়ে থুথু ছিটাল। লম্বা, একহারা এক লোককে দেখতে পেল রানা, খাকি ইউনিফর্ম পরে আছে। চেহারাই বলে দেয় মিশরীয়। তার বেল্টে ছোট একটা লেদার হোলস্টার, ফ্ল্যাপ আর ক্লিপ পকেটসহ। ছোট্ট .৩২ অটোমেটিকটা হাতে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে অস্ত্র ধরা হাতটা লম্বা করল সে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সাথে আসুন, এফেনডি।'

কি করা উচিত বুঝতে পারল না রানা, তবে জানে আলোচনা করার সময় নয় এটা। কাঁপতে কাঁপতে সিধে হলো ও, মনে হলো পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত টন টন করছে, এখনও ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

কিভাবে হাঁটতে পারল, কিভাবে লোকটার পিছু পিছু বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল, বলতে পারবে না রানা। বাইরে বেরিয়ে একটা ফোক্সওয়াগেন সিডানের দরজা খুলল লোকটা, রানা দেখল

পিছনের সীটে তার একজন সঙ্গী আছে। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, প্রায় একই চেহারা দু'জনের। 'গাড়িতে উঠুন, প্লিজ,' প্রথম লোকটা বলল, ভিড়টার দিকে নজর রাখছে সে, ওদের সাথে সাথে তারাও বেরিয়ে এসেছে। মারমুখো জনতার দিকে হাতের অস্ত্র তুলে গুলি করার হুমকি দিল সে। সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রানা। পিছনের লোকটা সামনে চলে এল, স্টার্ট দিল গাড়িতে।

ভিড়ের ভেতর উত্তেজনা বাড়ছে। হাত ছুঁড়ে, মুখ ভেঙচে প্রতিবাদ জানাচ্ছে লোকগুলো। গ্রামের ভেতর দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাল ড্রাইভার। ডান দিকে মোড় নিল ওরা, সামনে দেখা গেল লাইটপোস্টের সারি, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, ইন্টারন্যাশনাল রুট ফরটিফোর বরাবর দাঁড়িয়ে আছে।

নার্ভাস বোধ করছে রানা, শরীরের ক্ষতগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গেছে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও, আরবীতে।

'সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

এক মুহূর্ত কিছু বলল না রানা। সুয়েজ ক্যানেলে জাহাজগুলোর নেভিগেশন লাইট দেখতে পেল ও। এখানে এসে হাইওয়ের সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে খালটা, পুরানো রুট ফোর-এর পাশাপাশি—এই রাস্তারই আরও দক্ষিণে ল্যান্ড করেছিল ওদের জেট। আরও খানিক দূরে একটা রেললাইনও আছে।

কে.জি.বি-র হাত থেকে বেঁচে গেছে ও, মিশরীয় কৃষকদের কাছে থেকে পালাতে পেরেছে, কিন্তু তবু বিপদ এখনও কাটেনি। ওর এখনকার ভয়, উদ্ধারকারীরা ওকে মিশরীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে কিনা। মিশরে ওর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে না রানা। মিশরের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল, ওর

অনধিকার অনুপ্রবেশ গ্রহণযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে সেই সম্পর্কে চিড় ধরবে।

'আপনার উচ্চারণ ভঙ্গি ধরতে পারছি না,' ড্রাইভার বলল। 'আপনি কোন্ দেশের লোক, প্লিজ? এশীয়? আপনার নাম কি?'

নিরাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। এখন শুধু চুপ করে থাকতে পারে ও। ওরা জানে। প্রশ্ন করছে শুধু খেলার জন্যে, কিছুই ওদের অজানা নেই। পাশের লোকটাকে আড়চোখে লক্ষ করল ও, পিছনে দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন।

'আপনি উত্তর দিতে চান না?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার, নরম সুরে। উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল সে, 'আপনার সাথে কাগজ-পত্র আছে, এফেনডি?'

সংক্ষেপে জবাব দিল রানা, 'লস্ট!'

'তবে আপনি বাংলাদেশী।' বিবৃতির মত শোনাল, জিজ্ঞাসা নয়।

'গ্রামের লোকগুলো আমার সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে,' বলল রানা। 'একটা ক্রুজ শিপ থেকে ইসমাইলিয়ায় নামি আমি, একটা কাফেতে বসে কফি খাই। আমার সাথে একটা বোতল ছিল, সেটাও খালি করি। তারপর হুঁশ ফেরে মরুভূমিতে। কিভাবে কি ঘটল, আমি জানি না।'

বিশাল আকারের লোনা জলাভূমি দেখা গেল হাইওয়ের দু'দিকে, হাইওয়েটা সোজা উত্তর দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। চাঁদ উঠছে আকাশে, জলাভূমি চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। ক্যানেলের জাহাজগুলো নেমিসিস আর নিকোলাই প্যাসিমভের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। ওর ধারণা হলো, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বলেই ওকে এভাবে ফেলে পালিয়ে গেছে ডাচ জর্জ। তবু

ভাল যে প্যাসিমভকে নিয়ে পালাতে পেরেছে সে। রোডসে কি ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে নিজেকে ওর কালা আর অন্ধ বলে মনে হলেও, মনে মনে জানে এইচআরসি-র যদি আদৌ কোন দক্ষতা থাকে, এতক্ষণে প্যাসিমভকে নিশ্চয়ই তারা নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাহলে কর্নেল রুস্তমভকে ওরকম খুশি মনে হলো কেন?

কে.জি.বি. কর্নেলের 'নতুন নির্দেশ'-টা কি ছিল?

'ক্যানেল এরিয়ায় গোলাগুলির রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, এল বালাহ থেকে বেশি দূরে নয়। দুই রাত আগের ঘটনা,' বলল ড্রাইভার।

'আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই।'

'আমি কোন অভিযোগ করছি না,' বলল লোকটা, মৃদু কণ্ঠে।

এ-সবের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভাবল রানা।

ড্রাইভার বলল, 'আপনার সাথে কোন কাগজ-পত্রও নেই। তাই ভাবছি, কি সেই কারণ যে-জন্যে আমাদের দেশের বীর প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রীরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্বীকার করছি, এ-ধরনের জটিল পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নেই।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।

'ইউনিফর্ম দেখেই বুঝতে পারছেন, আমি সরকারের লোক, তাই না?'

মনে মনে শংকিত হলো রানা, তবে সতর্ক থাকল চেহারায় যেন প্রকাশ না পায়। 'হ্যাঁ, বোধহয়।'

'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে আছি, সত্যি কথা বলতে কি আমাকে

উন্নতি করতে হলে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মত করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আপনি বন্ধু দেশের নাগরিক হতে পারেন, কিন্তু আপনাকেও তো আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তাই না?'

রানা ভাবছে, সবচেয়ে খারাপটাই ঘটে গেছে। সরাসরি মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের হাতে পড়েছে ও। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সে ওর অনেক বন্ধু থাকলেও, তাদেরকে এই মুহূর্তে কোথায় পাবে ও? রানা একজন স্পাই, এটা যদি জানা থাকে এদের, রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে মাথায় গুলি করলেই বা কি করার আছে ওর? কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু বীর প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মন্ত্রীদের কথা কি যেন বলল লোকটা? কোথায় যেন কি একটা গোপন ব্যাপার আছে, ঠিক ধরতে পারছে না ও। 'তোমরা আমাকে পেলে কিভাবে?' জানতে চাইল ও। দিগন্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে পোর্ট সাঈদের আলোকমালা, লেক মানজালার একটা কোণ ছাড়িয়ে আরও অনেক সামনে।

'স্থানীয় গোলযোগ আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছে, তবে দু'দিন আগে গোলাগুলির ঘটনা ঘটার পর থেকেই এলাকায় তল্লাশী চালাচ্ছিলাম আমরা, কারণ কিছু রহস্যময় চরিত্র ঘুর ঘুর করার রিপোর্ট পেয়েছিলাম।' রানার দিকে শান্ত চোখে তাকাল সে। 'নেমিসিস নামে একটা জাহাজে উঠে তল্লাশী চালাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের। গোলাগুলির ঘটনা নাকি ওটাতেই ঘটে, পরে আমরা জানতে পারি। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম, ক্যানেল ছেড়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে জাহাজটা।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা। 'তবে আমি স্রেফ একজন ট্যুরিস্ট।' বলার মত এই একটা মিথ্যেই আছে ওর, সেটাই ধরে

থাকল। সময় পেলে মিথ্যেটা ধরে ফেলবে ওরা, রানা জানে। ওর সাথে এমনকি জাহাজের কোন টিকেটও নেই। তবে, এতে করে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে হাতে, যদি ওকে ওরা বেঁচে থাকার অনুমতি দেয়।

হঠাৎ হেসে উঠল ড্রাইভার। 'নাহ্, আসল কথাটা এবার বলেই ফেলি।'

'আসল কথা?'

'আপনাকে আমরা সাহায্য করছি,' বলল ড্রাইভার, হাসছে সে।

'সাহায্য করছেন?'

'পোর্ট সাঈদে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, বাংলাদেশ কনসুলেটে পৌঁছে দেব—আমার ওপর সেই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। বস্ বললেন, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাই চেয়েছেন। যদি আপনি মাসুদ রানা হন।'

ফাঁদ হতে পারে, ভাবল রানা। মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ইউনিফর্ম পরে না বলেই জানে ও। যদিও নতুন নিয়মে পরতেও পারে। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল ও, 'আমিই মাসুদ রানা।'

'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,' রানার দিকে ফিরে হাসল ড্রাইভার।

সীটে হেলান দিল রানা, সাথে সাথে মূল সমস্যাটা ফিরে এল মনে। কর্নেল রুস্তমভকে অত খুশি লাগল কেন?

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা-১৭৮

বিষকন্যা-১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

এবার সুন্দরী এক জলপরীর খপ্পরে পড়েছে মাসুদ রানা। তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা। ওদিকে ধাওয়া করছে ওকে চিরশত্রু ইন্টেলিজেন্স অফিসার কর্নেল রুস্তমভ।

রোডস আইল্যাণ্ডের ভিলায় পাওয়া দগ্ধ লাশটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল না। গ্রীক কোটিপতি কোস্টাস অ্যারোনাকিস কি সত্যিই মারা গেছে?

ব্যারেলের ভেতর জিনিসটা কি শুধুই হলুদ কাদা?

বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাসিভ কার হাতে পড়লেন?

বেশ জমে উঠেছে নাটক।

বাইশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০